ছোটদের
বইয়ের
স্বপ্নরাজ্য

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগের
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড,

৪.৮
৪৭৫

শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর

মনিবাগচি

শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর • মনিবাগচি
Code no 4.8
SL no 4050
MSSO In the Press

শিশুগ্রন্থালী বিদ্যাসাগর : ৩

৪.৮

স্মরণীয় - বরণীয় - ৩

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৪৭৫

বিদ্যাসাগর

অমি বাগচি

শৈব্যা পুস্তকালয়
৮/১ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : : কলিকাতা ১২

Acc no. - 15005

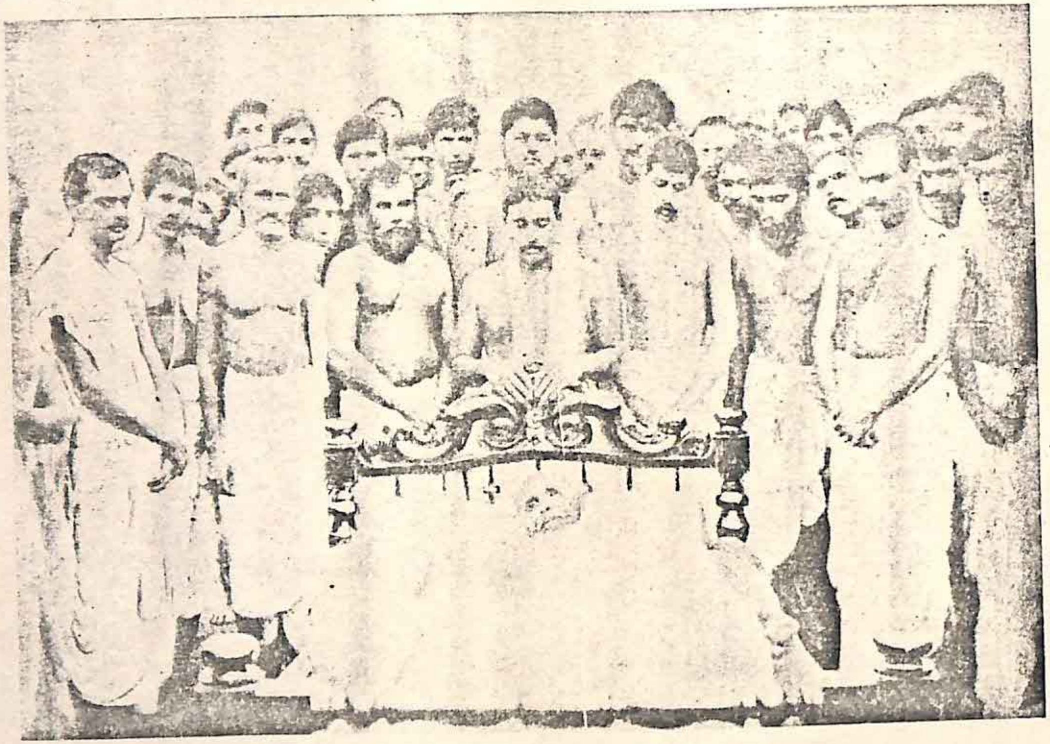

মহাপ্রয়াণে বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর

আমাদের এই দেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায় — মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।... বিদ্যাসাগর যে বাঙালি বড়োলোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব। — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিদ্যাসাগর আমাদের জাতীয় জীবনের একটি দুর্লভ সম্পদ।

সর্বকালের আদর্শ পুরুষ তিনি – মনুষ্যত্বে এবং চরিত্রগৌরবে।

তাঁর 'বর্ণপরিচয়' দিয়ে যেমন ছেলেমেয়েদের অক্ষর পরিচয় হয়, তেমনি তাঁর মহৎ জীবন পাঠ করে, তাঁর চরিত্রের স্মরণ করে তারা যাতে নিজেদের চরিত্র গড়ে তুলতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই লেখা হলো এই সাগর-চরিত।

সাগর-চরিত চির-নূতন। এ কখনো পুরোনো হবার নয়। তাঁরই জীবনে ধ্বনিত হয়েছে মনুষ্যত্বের অভয়-কণ্ঠ। মহাভারতের কথা যেমন অমৃত সমান, বিদ্যাসাগরের জীবনকথাও ঠিক তেমনি – সুপেয়, সুস্বাদু ও কল্যাণকর।

বিদ্যাসাগর একটি প্রাতঃস্মরণীয় নাম। এই নামটি তোমাদের হৃদয়ের মালা হোক। তাঁর চরিত্রের তেজস্বিতা, করুণা ও নির্ভীকতা তোমাদের জীবনেও সত্য হোক, সার্থক হোক।

আর্য সারথি

॥ এক ॥

কার সাহেব খাঁটি ইংরেজ। হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল তিনি। যেমন বিদ্বান তেমনি দাম্ভিক। ভারতবাসীকে 'নেটিভ' ছাড়া বলেন না। নিগ্রোদের ধার ধারেন না। কোনো দেশীয় জ্ঞানী লোক তাঁর কাছে কোনো বিষয়ে দেখা করতে গেলে তাহলে কার সাহেব তাঁকে মোটেই খাতির করতেন না। পৃথিবীতে একমাত্র ইংরেজ ছাড়া আর সব অমানুষ — এই ছিল তাঁর ধারণা। এ হেন কার সাহেবকে একদিন এক একটা ব্যাপারে আসতে হলো সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের সাথে দেখা করতে। এই সহকারী সম্পাদক ছিলেন একজন টুলো-ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

কার সাহেব আসছেন শুনে সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত ব্যস্ত হলেন, কিন্তু সহকারী সম্পাদকের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই! অথচ সাহেবের দরকার তাঁর কাছেই, তাই সাহেব সোজা তাঁরই ঘরে ঢুকে পড়লেন। ঘরের মধ্যে ছিল শুধু একখানা টেবিল আর একখানা চেয়ার। দ্বিতীয় চেয়ার নেই যে সাহেব তাতে বসবেন। সাহেব তাই ঘরের মধ্যে ঢুকে একবার এদিক-ওদিক তাকালেন। তারপর যখন দেখলেন, যাঁর সাথে তিনি দেখা করতে এসেছেন সেই পণ্ডিতটি তাঁকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে তো দাঁড়ালেনই না, বরং দিব্যি টেবিলের ওপর পা দুটি তুলে দিয়ে হুঁকো টানছেন একমনে। সাহেব যে ঘরের মধ্যে এসেছেন তা তাঁর খেয়ালই নেই।

কার সাহেব চমকে উঠলেন। একজন নেটিভ পণ্ডিতের এইরকম অশিষ্ট আচরণে তাঁর লাল মুখ যেন আরো লাল হয়ে উঠলো। মনের মধ্যে রাগটাও হলো প্রচুর। একজন সামান্য টুলো পণ্ডিত তাঁর সাথে যে এই রকম রূঢ় আচরণ করতে পারেন — এ তিনি তাঁর

বাইরের দিকটারই। অর্থাৎ কেবল, কার সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পণ্ডিতের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে চলে গেলেন। রাস্তায় যেন তিনি যেন গর্ গর্ করছিলেন। ফিরে গিয়েই নালিশ করলেন ওপরওয়ালার কাছে। তিনিও এক সাহেব। তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের কাছ থেকে তাঁর এই রকম অভদ্র আচরণের জন্য কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠালেন।

কৈফিয়ৎ দিলেন সেই নির্ভীক পণ্ডিত। তাতে তিনি লিখলেন: 'এই রকম ব্যবহার আমি [illegible] সাহেবের কাছেই শিখেছি। শিষ্টাচার আমরা খুব ভালো করেই জানি। কিছুদিন আগে আমি যখন একটা কাজে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন দেখি সাহেব টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে চুরুট ফুঁকছেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, সাহেব আমাকে বসতে পর্যন্ত বললেন না। আমি ভেবেছিলাম [illegible] এই রকমই কুর্নিশ করতে হয়! এটাই বুঝি বিলাতি শিষ্টাচার। সাহেব আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে আমিও ঠিক তাই করেছি। কাজেই এতে আমার একটুকু দোষ হয়েছে বলে আমি মনে করি নি।'

পণ্ডিতের এই কৈফিয়ৎ যখন পাঠিয়ে দেওয়া হলো কার সাহেবের কাছে। তার পাশে ওপরওয়ালা এই মন্তব্যটুকু লিখলেন: 'এবিষয়ে আপনার কিছু বলার আছে?' কার সাহেব কৈফিয়ৎটি মন দিয়ে পড়লেন। বুঝলেন তিনি খুব মোক্ষম লোকের পাল্লায় পড়েছেন! যাকে এতদিন নিরীহ টুলো পণ্ডিত বলে মনে করেছি আসলে তিনি যে এমন একজন নির্ভীক চরিত্রের আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ, সাহেব তা বুঝতে পারলেন। এখনই তিনি এমন শিক্ষা পেলেন যা তিনি জীবনে ভুলতে পারেন। তবে তিনি ইংরেজ লোক, তাই নিজের ত্রুটি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হলেন না। ওপরওয়ালা

লিখে পাঠালেন : 'পণ্ডিতের নির্ভীকতা অসাধারণ ঠিক। অন্যায়টা আমারই হয়েছে অর্থাৎ প্রধান কর্তব্যে ত্রুটি। সত্যিই যে শিষ্টাচার কখনই ভুলতে দেওয়া সমর্থিত তাঁকে।'

এই নির্ভীক তুলো পাঠেরই আমাদের বিদ্যাসাগর।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর -- বাঙালীর চিরকালের গর্ব ও গৌরবের পাত্র।

#Space#

মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রাম।

সেই গ্রামে এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে একদিন দুপুরবেলায় শাঁখ বেজে উঠলো। সেই শুভ শঙ্খধ্বনি জানিয়ে দিলো এক মহাপুরুষের আবির্ভাব। সেদিন ছিল মঙ্গলবার (১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ)। হাটবার। ঠাকুরদাস হাটে জিনিসপত্র কিনতে গিয়েছিলেন। তিনি যখন ফিরছেন তখন মাঝপথে রামজয় তর্কভূষণ এগিয়ে গিয়ে ছেলেকে বললেন — ঠাকুরদাস, আজ আমাদের একটি এঁড়ে বাছুর হয়েছে।

ঠাকুরদাস কিছুই হেঁয়ালি বুঝতে পারলেন না। তিনি তাই বাড়িতে ঢুকেই গোয়াল ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন এঁড়ে বাছুরটিকে দেখবার জন্য।

— ওদিকে নয়, এদিকে এসো। হেসে বললেন রামজয়।

এই বলে ছেলেকে আঁতুড় ঘরের দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে ভেতরে সদ্যোজাত শিশুকে দেখিয়ে বললেন — এই দ্যাখো এঁড়ে বাছুর। আমি বলে রাখছি, এ ছেলে ভীষণ একগুঁয়ে হবে কিন্তু বংশের মুখ রাখবে।

দৈবজ্ঞানীর মত অন্তরে অন্তরে যেন জেনেছিলেন এই কথা। নবজাত শিশু

শুধু বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের মুখ রাখেনি — উত্তরকালে সারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন তিনি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মের শুভলগ্নে বিধাতা তাঁর কপালে কি লিখে দিয়েছিলেন, তা তিনিই জানতেন। কিন্তু তাঁর ঠাকুরদা রামজয় ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন, বীরসিংহের এই কুঁড়ে ঘরে দারিদ্র্য সমুদ্রের মধ্যে আজ যে ছেলেটি জন্মালো সে হবে অসাধারণ হবেই।

অসাধারণ তিনি সত্যিই হয়েছিলেন — জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি রেখে গিয়েছেন এই অসাধারণত্বের স্বাক্ষর। ছোটদের জন্য অ আ ক খ-র বই 'বর্ণপরিচয়' লেখা থেকে শুরু করে বিধবার বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত — সকল কাজে দেশবাসী এই এঁর বহুমুখী অসাধারণত্বের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিল। সেদিন বাংলা দেশে এই যিনি অনুপম ছিলেন যাঁর চরিত্র, সত্য আর ন্যায়ের অনলের মতো চিরকাল হয়ে আছে। শুধু বীরসিংহের রামজয় তর্কভূষণের পর্ণকুটিরে নয়, সেদিন সমস্ত বাংলা দেশটাই যেন অপেক্ষা করেছিল এমনি একজন অসাধারণ মানুষের জন্য যাঁর কোমলে কঠোর চরিত্র ঘুমন্ত বাঙালিকে মনুষ্যত্বের মন্ত্রে নতুন করে দীক্ষা দেবে। এই দেশের দুর্যোগে, ইতিহাসের প্রয়োজনে আজ থেকে দেড়শো বছর আগে শুভ লগ্নে জন্মেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

—

॥ দুই ॥

মেদিনীপুর জেলার বনমালীপুর গ্রাম।

সেই গ্রামে বাস করেন কয়েকঘর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। তাঁদের পদবী ছিল 'বন্দ্যোপাধ্যায়'। একান্নবর্তী সংসার। বাঁড়ুজ্যেরা পাঁচভাই। মেজ ভাই রামময়। ন্যায়শাস্ত্রের নাম-করা পণ্ডিত। 'তর্কভূষণ' - উপাধির মধ্যে ছিল এই পাণ্ডিত্যের পরিচয়। দুর্গাদেবী তাঁর স্ত্রী। বড় আর মেজ ভাইয়ের ওপর ছিল সংসারের সকল দায়-দায়িত্ব। রামময় শুধু পণ্ডিতই ছিলেন না, অত্যন্ত তেজস্বীও ছিলেন। সেই তেজ যেন তাঁর কথায়, তাঁর আচরণে ফুটে বেরুতো। কোনো রকমের অন্যায় আচরণ তিনি সইতে পারতেন না। আবার অন্যদিকে খুব শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন রামময়। সংসারে ঝগড়া-ঝাঁটি তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু একান্নবর্তী সংসারে প্রধানত শান্তি সম্ভব নয় — বিশেষ করে ভাইদের রোজগারের ওপর যখন সংসারকে নির্ভর করে থাকতে হয়; তখন কোনো অন্য ভাইদের বউ থেকে যে দু-একটা কড়া কথা শুনতেই হবে।

রামময়ের দুই ছেলে আর চারটি মেয়ে। সবাই ছোট। বড় ছেলেটির নাম ঠাকুরদাস। তাঁর বয়স তখন আট দশ বছর। দিন যায়। ক্রমে সংসারে অশান্তি বাড়ে। ঠাকুরদাসের মাকে সব সহ্য করতে হয় মুখটি বুজে। কখনো তাঁর স্বামীকে তো কোনো অভিযোগ করেন না। ক্রমে অন্য ভাইদের সঙ্গে বিষয় নিয়ে মতান্তর হলো রামময়ের। সংসারের ওপর তাঁর মন আর কোন আকর্ষণ রইলনা। ঠিক করলেন সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে কোথাও তিনি চলে যাবেন। একদিন সত্যি সত্যি রামময়কে আর বনমালীপুরে দেখতে পাওয়া গেলনা।

এক মাস দু'মাস করে দু'মাস কেটে গেল।

কিন্তু রামজয়ের আর কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না। তখন দুর্গাদেবীর পক্ষে এ-সংসারে থাকা অসহ্য হয়ে উঠলো। দেবরদের দুর্ব্যবহার চরমে উঠলো। সবাই মনে করে অলক্ষুণে। শেষ পর্যন্ত শ্বশুরের ভিটেয় থাকতে না পেরে তিনি বীরসিংহ গ্রামে তাঁর বাপের বাড়ি চলে গেলেন ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে। সেখানেই শুধু অভাব, অথবা দুর্ভাগ্য।

বিদ্যাসাগরের ঠাকুরদার কথা আরও একটু বলি। কেননা তাঁর এই পৌত্রটি ঠাকুরদার অনেক গুণের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। আগেই বলেছি রামজয় ছিলেন খুব তেজস্বী ছিলেন। সাহসও তাঁর ছিল তেমনি। গায়ের জোরও ছিল তেমনি। সে সময়ে মেদিনীপুরের তাঁর মতো সাহসী আর শক্তিমান পুরুষ খুব কমই ছিল। তিনি বাঘ-ভালুকের সামনে পর্যন্ত যেতে ভয় পেতেন না।

একবার তিনি বীরসিংহ গ্রাম থেকে মেদিনীপুর শহরে যাচ্ছিলেন। তখনকার দিনে ঐ অঞ্চলের পথ-ঘাট খুব নিরাপদ ছিল না। পথের দু'পাশেই গভীর বন-জঙ্গল। বনে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ঘর এই অরণ্য। রামজয় চলেছেন একমনে। হাতে একটা প্রকাণ্ড লোহার লাঠি। যদি দরকার হয়েই তিনি ব্যবহার করবেন। হঠাৎ সামনে একটা ভালুককে দেখতে পেয়েই তিনি দাঁড়ালেন একটা বড় গাছের আড়ালে। ভালুক যেন মানুষের গন্ধ পেয়েছে — সেও ছাড়বার পাত্র নয়। ফোঁস ফোঁস করতে করতে গাছের সামনে এসে দাঁড়াল সেই বিরাট জানোয়ার জন্তুটা। পেছনের দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, সামনের পা দুটো গাছটির গুঁড়ির দু'দিক দিয়ে বাড়ালো ঠিক যেন দুখানা হাত। শিকারকে ধরতে হবে। রামজয় অমনি ভালুকের পা-দুটো দু'দিক থেকে দু'হাতে খুব শক্ত করে ধরলেন আর গাছের গুঁড়িটার

সঙ্গে প্রাণপণ শক্তিতে ঘোরাতে লাগলেন। লাঠির চোটে ভালুকের অবস্থা তখন কাহিল। কিছুক্ষণ পরে সে প্রচণ্ডভাবে চিৎপাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

রামজয় মনে করলেন ভালুকটা মরে গেছে। তাই তিনি নিশ্চিন্ত মনে আবার পথ চলতে আরম্ভ করলেন। সেই দু-চার পা এগিয়েছেন, অমনি ভালুকটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে তাঁকে থাবা দিয়ে আঁচড়ে দিলো। ভালুকের থাবাটা সম্ভবত তাঁর পেটে বসে যেত। কিন্তু রামজয়ের হাতে ছিল সেই লোহার লাঠি। সেই দিয়ে তিনি ভালুকটার নাকের উপরে বসিয়ে দিলেন এক ঘা। প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে ভালুকটা ঘুরে পড়ে গেল। তার উপর আবার কয়েক ঘা পড়তে এবার ভালুকটা পঞ্চত্ব পেলো। কিন্তু তার নখের সেই চিহ্ন রামজয়ের শরীরে ছিল।

তখন ঐ অঞ্চলে অনেক ভালুক বাস করতো। দিনে-দুপুরে কেউ যদি জঙ্গলা পথ দিয়ে হাঁটতো এবং হঠাৎ যদি সে কোনো ভালুকের কবলে পড়তো, তাহলে তাকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হতো না। কিন্তু রামজয় সেই লোহার লাঠি সঙ্গে করে একাকী নির্ভয়ে চলাফেরা করতেন। ডাকাতদের সাধ্যি ছিল না এই মানুষের কেশাগ্র স্পর্শ করে। রামজয়ের ভয়ে ডাকাতরা পর্যন্ত তটস্থ থাকতো।

পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পিতামহের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন এই অসীম সাহস, শক্তি আর তেজস্বিতা।

#space#

স্বামী নিরুদ্দেশ। দুঃসময় নেমে এলো।

দুর্গাদেবী চলে এলেন তাঁর বাপের বাড়িতে।

ভাবলেন বাপের বাড়িতে তো গঞ্জনা সইতে হবে না, আদর-যত্ন নিশ্চয়ই পাবেন। প্রথম-প্রথম কয়েকদিন তিনি আদর-যত্ন পেলেন। কিন্তু সেখানে তখন কর্তা ভাই আর ভাই-বৌ। দু'দিন যেতেই দুর্গাদেবীকে তাঁরা উঠতে-বসতে কথা শোনাতে লাগলেন। মুখ বুঁজে সহ্য করেন দুর্গাদেবী। স্বামী যাঁর নিরুদ্দিষ্ট, যাঁকে দু'টি ছোট-ছোট ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে হবে, তাঁর পক্ষে সবই মুখ বুঁজে সইতে হয়। কিন্তু বাপের বাড়িতে এই অনাদর ও অবহেলা যখন চরমে উঠলো তখন দুর্গাদেবী একদিন তাঁর বাবাকে বললেন, বাবা, তুমি এখন বুড়ো হয়েছ, এ-সংসারে তোমার কোনো কথাতে খাটে না। তাই আমারও এখানে আর থাকা হলো না।

— তাহলে কোথায় যাবি তুই? — জিজ্ঞাসা করেন বৃদ্ধ চন্দ্রসিদ্ধান্ত।

— মাঠের ঐ কোণটায় আমার থাকবার জন্য একটা কুঁড়ে ঘর তুলে দাও।

— তা না হয় দিলাম, কিন্তু খাবি কি? একা হলে না হয় ভাবনা-চিন্তা ছিল না।

— চরকায় সুতো কেটে খাবো।

শেষে সেই ব্যবস্থাই হলো। চরকায় সুতো কেটে দিনাতিপাত করেন দুর্গাদেবী। কারো সাহায্য তিনি নেবেন না। স্বামীর মতোই তাঁর মনের দুর্জয় বল। পরের অনুগ্রহে জীবনধারণ করার চেয়ে বিড়ম্বনার আর কিছু নেই। স্বামী একদিন নিশ্চয়ই ফিরবেন — এই বিশ্বাস ছিল দুর্গাদেবীর। এই বিশ্বাসেই তিনি বুকে বল বেঁধে ছেলেমেয়েদের নিয়ে পর্ণকুটীরে প্রবাসিনী মত করতে লাগলেন। বড় হলে ঠাকুরদাস মায়ের কষ্ট দেখেন আর ভাবেন কি করলে মায়ের দুঃখ লাঘব করা যায়।

দেখতে দেখতে পাঁচ কুড়ি কেটে গেল।

ঠাকুরদাসের বয়স তখন পনর ষোল। একদিন তিনি দুর্গাদেবীকে বললেন— মা, আমি কলকাতায় যাই।

— সেখানে গিয়ে কি করবি?

— চাকরি করব।

— চাকরি করবি?

— হ্যাঁ মা। তোমার দুঃখ আর দেখতে পারি না। আমি তো এখন বেশ 2
বড় হয়েছি।

ছেলের কথা শুনে মা হাসেন, কিন্তু তাঁর মনে মনে দুই চোখ জলে ভরে যায়। এতটুকু ছেলে, চাকরি করবে! ভাবতেও তাঁর বুক ফেটে যায়।

ঠাকুরদাস বললেন, গরীবদেরও তো মানুষ করতে হবে, মা। আমি কলকাতায় যাই। তুমি মত দাও।

দুর্গাদেবীর মত ছিল না। তাঁর স্বামী ছিলেন বড় পণ্ডিত, ছেলেকেও তিনি তেমনি পণ্ডিত করে তুলবেন। কিন্তু অদৃষ্ট এমনি মন্দ যে, যে বয়সে ছেলের লেখাপড়ার সময়, সেই বয়সে তাকে চাকরির জন্য যেতে হচ্ছে কলকাতায়। অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত দুর্গাদেবী মত দিলেন। তারপর একদিন শুভদিনে মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে ঠাকুরদাস বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতা রওনা হলেন।

কলকাতা

শহর কলকাতা। কোম্পানির আমলের নতুন শহর। তবে তখনো পর্যন্ত পুরো শহর

Acc. no. - 15005

হয়ে ওঠেনি। ঠাকুরদাস চলেন সেই শহরে চাকরির খোঁজে। উঠলেন এক আত্মীয়ের বাসায়। কিন্তু একটু ইংরেজী না জানলে কি করে চাকরি হয়? নতুন যুগের নতুন ভাষা ইংরেজী। ওর বিদ্যে তো মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পর্যন্ত। তখন সবে এ-দেশে ইংরেজী লেখাপড়া শুরু হয়েছে। বড়লোকের ছেলেরা ছাড়া কেউ ইংরেজী শিখতে পারত না। সবাই বলে, ইংরেজী শিখতে পারলে সাহেবদের অফিসে একটা চাকরি জুটতে পারে।

কিন্তু কি করে ইংরেজী শেখা যায়?

যে আত্মীয়টির বাড়িতে থাকতেন তাঁকেই ধরলেন ঠাকুরদাস। তাঁর জানাশুনা এক ভদ্রলোক অল্পবিস্তর ইংরেজী জানতেন। তাঁর কাছেই ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। ভদ্রলোকটি থাকতেন একটু দূরে। দিনের বেলায় সন্ধ্যে ছাড়া তাঁর সময় নেই। ঠাকুরদাস রোজ সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাড়িতে গিয়ে ইংরেজী শিখতে লাগলেন। বাসায় ফিরতে রাত হয়ে যেত। কাজেই প্রায় প্রতি রাত্রেই তাঁকে উপোস করে থাকতে হতো। তা হোক। তবু ইংরেজী শিখতে হবে। চাকরি একটা জোটাতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরদাসের চোখের সামনে ভেসে উঠলো বীরসিংহ গ্রাম। ছোট্ট একখানি কুটীর। সেখানে দাওয়ায় বসে চরকার সূতো কাটছেন তাঁর দুঃখিনী মা। সেখানে রয়েছে তাঁর ছোট ছোট ভাইবোনগুলি। হয়ত ওদের রোজ পেট ভরে খাওয়া হয় না। এমন ঠাকুরদাস ওদেরই চিন্তায় ডুবে থাকেন। কখনো কখনো এমন হতো যে, সারাটা দিনও তাঁর অন্ন জুটত না। তাতেও তাঁর আক্ষেপ নেই। মুড়ি মুড়কি খেয়ে, কখনো বা শুধু রাস্তার কলের জল খেয়ে তিনি দিন কাটাতেন। এইরকম কষ্ট করে কিছু ইংরেজী শিখে ঠাকুরদাস অবশেষে দু'টাকা মাইনের একটা চাকরি পেলেন।

কলকাতা থেকে খবর এলো ছেলের চাকরি হয়েছে।

শুনে দুর্গাদেবীর সে কি আনন্দ! দুঃখের সংসারে বুঝি সুখের দিন এলো। মন থেকে আশীর্বাদ করেন ঠাকুরদাস। মনিব সন্তুষ্ট হয়ে মাইনে বাড়িয়ে দেন। তাঁর কাছে থাকা খাওয়া-দাওয়া বাদ, তাই ঠাকুরদাসের মাইনে হলো আট টাকা। সেকালের দিনে এই আটটাকার অনেক দাম ছিল। নিজের জন্য অল্প কিছু রেখে বাকীটাকা তিনি তাঁর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। ঠিক এমনি সুদিনেই নিরুদ্দিষ্ট রামজয় একদিন হঠাৎ দেশে ফিরলেন।

দেশে ফিরে রামজয় জানলেন তাঁর ছেলে-বৌ কেউ বনমালীপুরের বাড়িতে নেই। এখন তিনি বীরসিংহ গ্রামে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে [redacted]। সেখানেও দুর্গা-দেবী নেই। শেষে সন্ধান পেলেন একটি সামান্য কুঁড়েঘরের। সেইখানে রয়েছেন তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে। সাধ্বী স্ত্রীর এই স্বাধীন চিত্ততা দেখে রামজয় যারপরনাই সন্তুষ্ট হলেন। যখন তাঁর সহোদর ভাইদের গুণের কথা সব শুনতে পেলেন তখন তিনি আর বনমালীপুরের পৈতৃক ভিটায় ফিরে যেতে চাইলেন না। থেকে গেলেন বীরসিংহ গ্রামেই।

রামজয় তর্কভূষণ গরীব ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনটা ছিল খুব বড়। কিছুতেই কারো অনাদর বা অপমান তিনি সহ্য করতে পারতেন না। টাকার লোভে কখনোও কারো তোষামোদ করা তাঁর স্বভাবের সঙ্গে মোটেই খাপ খেতো না। নিজে যা ভালো বুঝতেন তাই করতেন। অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতেন না। দারিদ্র্য থাকলেও তিনি, কিন্তু বড়লোকের অনুগ্রহের একটুকু প্রত্যাশী ছিলেন না। অত্যন্ত তেজস্বী মানুষ। কেউ তাঁর

করতে যে অসমর্থ হবে হলে সবাই এসে বলতে নিমন্ত্রণ পেতেন না। বড়লোক, টাকা আছে, কিন্তু ব্যবহারে যে কাণ্ডকারখানা অর্থাৎ ভদ্র নয়, এমন লোককে রামজয় । একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না।

আমাদের পিতামহের ওঁর ঠাকুরদার এইসব গুণই পুরোমাত্রায় পেয়েছিলেন।

একদিন। বীরসিংহের এক বোষ্টম গেলো রামজয়ের সঙ্গে দেখা করতে। সে- গিয়ে তাঁর ছিল খুব ভক্তি। তিনি রামজয়কে খুবই শ্রদ্ধা করতো। কথায় কথায় তিনি বললেন, ঠাকুর, আমার খুব ইচ্ছা যে আপনাকে কিছু নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি দান করি।

— জমি নিয়ে কি করব? — বললেন নির্লোভী ব্রাহ্মণ

— সেই জমির ওপর একখানা আটচালা তুলে বাস করবেন।

— এই তো বেশ আছি।

— এই একখানা ঘরে আর কতটুকু জায়গাতে আপনার যে আর এখন কুলোয় না।

— তাই বলে কারো দান গ্রহণ নিতে পারি না। ছেলেরা পারে যদি নেবে।

এই বাড়িতে এত অসুবিধা সত্ত্বেও, আত্মীয়-স্বজনেরা অনেক পরামর্শ দিলো। কিন্তু রামজয়ের সেই এক কথা — কারো দান গ্রহণ নিতে পারবো না। বীরসিংহ গ্রামে কিছুদিন কাটিয়ে রামজয় গেলেন কলকাতায় ছেলেকে দেখবার জন্য। ফিরে ফিরে এসেছেন. এই খবর ঠাকুরদাস আগেই পেয়েছেন।

।। তিন ।।

গ্রামে গেলেন ঠাকুরদাস নিজে হাত পুড়িয়ে রান্না করে খান। মানুষটি অতি সরল। এইবার তিনি এই বয়সে সংসারের ভার নিজের মাথায় তুলে নিয়েছেন। ঠাকুরদাস যেখানে থাকতেন সেই বাড়ির কর্তার কাছে রামজয় শুনলেন তাঁর ছেলের লেখাপড়ার কথা, শুনলেন তাঁর অন্যান্য গুণের কথা। খুশিতে ভরে উঠে পিতার বুক। কিন্তু এভাবে থাকলে ঠাকুরদাসের শরীর টিকবে না। মনে পড়ে গেল বড়বাজারে দয়েহাটায় ভাগবতচরণ সিংহের কথা। লোকটি যেমন ধার্মিক তেমনি দয়ালু। তিনি রামজয়কে খুব শ্রদ্ধা করতেন। শেষ পর্যন্ত রামজয় সিংহ মহাশয়ের বাড়িতেই ছেলের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

ভাগবতচরণ সিংহের বাড়িতে এসে থাকতে লাগলেন ঠাকুরদাস। খাওয়া-দাওয়ার সুবিধা তো হলোই, তার উপর। সিংহ মশাইয়ের চেষ্টায় ঠাকুরদাসের একটা ভালো চাকরিও জুটে গেল। মাইনে হলো দশ টাকা। ছেলের মাইনে বেড়েছে শুনে দুর্গাদেবীর আনন্দের সীমা রইলো না। একদিন তিনি স্বামীকে বললেন, ঠাকুরদাসের এখন বয়স হলো। এবার ওর বিয়ে দিয়ে একটি বৌ ঘরে নিয়ে এসো।

ঠাকুরদাসের বয়স তখন চব্বিশ পূর্ণ।

—বেশ, ভালো কথা। আমিও মেয়ে দেখছি; বললেন রামজয়।

তারপর অনেক খোঁজাখুঁজির পর গোঘাটের রামকান্ত তর্কবাগীশের একটি মেয়ের খোঁজ পাওয়া গেল। নাম ভগবতী। ভগবতীই বটে, রূপ যেমন, গুণও তেমনি। রামজয়ের খুব পছন্দ হলো। মেয়ের বাবাও খুব ভালো লোক। দুর্গাদেবীকে এসে বললেন সব কথা। শুনে তিনিও খুশী হলেন। বিয়ের দিন ঠিক করে অনেকেরা

পঞ্চাননকে একখানা চিঠি লিখে দিলেন রামজয়। তারপর একদিন শুভ লগ্নে (রামকান্তপণ্ডিতের দ্বিতীয় কন্যা) ভগবতী দেবীর সঙ্গে ঠাকুরদাসের বিয়ে হলো। সৌভাগ্যের সূচনা করতে স্বামীর ঘরে এলেন ভগবতী।

এই ভগবতী দেবীই আমাদের বিদ্যাসাগরের মা।

মায়ের মতো মা ছিলেন ভগবতী দেবী। তাঁর রূপের কথা থাক, গুণের কথা বলে শেষ করা যায়না। বিদ্যাসাগরের মা সকল দিক দিয়েই ছিলেন এক অসাধারণ স্ত্রীলোক। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: ভগবতী দেবী যে অসামান্যা রমণী ছিলেন। তাঁর পবিত্র মুখশ্রীর গম্ভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায়না। উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে এবং বহু ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।... ভগবতী দেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশীকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত। রোগার্তের সেবা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান এবং শোকাতুরের দুঃখে শোক প্রকাশ করা তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক ছিল।

তাঁর মায়ের এই অসাধারণ গুণগুলোকে পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

ছোটবেলা থেকেই ভগবতী দেবী শান্তশিষ্ট ও ধীর ছিলেন। সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলেছিল হৃদয়ের উদারতা আর অফুরন্ত স্নেহ। সূর্যের আলো যেমন চারদিকে বিকীর্ণ হয়, ফুলের গন্ধ বাতাসে, ভগবতী দেবীর অন্তরের দয়া-দাক্ষিণ্য তেমনি চারদিকে

ফুরিয়ে পড়তো। সে দয়া মানুষের মধ্যে ইতর-ভদ্র, ছোট-বড়, ব্রাহ্মণ-শূদ্র কিছু ভেদ করত না। সকলের প্রতি ছিল তাঁর সমদৃষ্টি। শুধু কি দয়া? বুদ্ধি, তেজ সব সদ্গুণই এই মহীয়সী নারীর মধ্যে সমভাবে বিকাশলাভ করেছিল। বীরসিংহের সকলেই রামজয়ের পুত্রবধূর প্রশংসা করতো। রামজয় মাঝে মাঝে ঠাকুরদাসের মাকে বলতেন, কেমন লক্ষ্মীর মতো বৌ এনেছি, বলো?

দুর্গাদেবী সায় দিতেন।

ছেলে যখন উপার্জন করে, সংসারে লক্ষ্মীর মতো বৌ এসেছে, সেখানে থেকে রামজয়ের সংসারের লক্ষ্মী-শ্রী ফিরে এলো। তারপর যেদিন যখন দরিদ্রের পর্ণকুটীর আলো করে জন্মালেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেদিন থেকে দুর্গাদেবীর আনন্দের ষোলকলা পূর্ণ হলো। পৌত্রের জন্মকালেই রামজয় স্ত্রীকে বলেছিলেন, দেখে নিও, এই ছেলে থেকেই বাঁড়ুয্যে বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে। তোমাকে তো বলিনি, সেই যে ঠাকুরদাসের বিয়ের পর প্রথম আবার তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে-ছিলাম তখন কাশীতে বিশ্বনাথ [illegible] স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, তোমার বংশে এক মহাপুরুষ আসছে — বাড়ি ফিরে যা।

দুর্গাদেবীর সমস্ত শরীর যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো এই কথা শুনে। মনে মনে তিনি শিবের উদ্দেশে প্রণাম জানালেন। ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, বাবা ও মা-সকলের সকল গুণ নিয়ে যে শুভলগ্নে জন্মেছিলেন তিনিই না বিদ্যাসাগর, উত্তরকালে যুগপুরুষ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। আমাদের দেশের সত্যিই তখন প্রয়োজন হয়েছিল এমনি একজন মহাপুরুষের। বিধাতা ইচ্ছে করে তাই বিদ্যাসাগরকে পাঠিয়েছিলেন এই বাংলাদেশে।

space

রায়েদের নাতির নাম রাখলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

বড় অদ্ভুত নাম। দু-কানেতে এমন নাম শোনা যায়নি। বীরসিংহের প্রবীণ মাতব্বর একদিন এসে বললেন, ঠাকুর মশাই নাতির এটি কি বিদঘুটে নাম রাখলেন?

— কেন, ঈশ্বর নামটা কি খারাপ?

— না, তা নয়। তবে ঈশ্বর মানে তো ভগবান। আমাদের নাতি কি তাই —

— নির্বুদ্ধি তোমাদের! ঐ নামটা রেখেছি এই মনে করে যে, বড় হয়ে আমার নাতি তোমাদের কাছে দয়ালু হবে, ওঁর মতো তেজী হবে, ওঁর মতো দাতা হবে। এসব ভেবেই তো এই নাম রেখেছি।

— জানলেন কি করে?

— সেসব অনেক কথা। তোমাদের জেনে দরকার নেই।

— আর নামের সঙ্গে এ যে চাঁদ জুড়ে দিয়েছেন?

— হ্যাঁ। চাঁদের আলোর মতো আমার এই নাতির যশের আলো একদিন ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে। তখন আমি সুখী হবো। তবে তোমাদের কেউ যদি বেঁচে থাকো তো আমার কথা মিলিয়ে নিও।

মাতব্বর আর কথা বললেন না। চলে গেলেন তিনি। দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন দুর্গাদেবী। তিনি সামনে বেরিয়ে এলেন। একটু হেসে বললেন, কি গো, তোমার মাথা খারাপ হলো নাকি?

— তার মানে?

-এই যে সকলের কাছে বলে বেড়াচ্ছ, তোমার নাতি কেউ হবে, কেউ হবে।

তো নাতি বড়ো হোক্‌ই আগে, তারপর —

- কি বলছ গিন্নী? আমার তীর্থের স্বপ্ন মিথ্যে হবার নয়।

- সত্যি হলেই ভালো।

- ঠাট্টা করছ বুঝি। আমি জ্যোতিষীকে দিয়ে গণিয়ে দেখেছি। ঠাকুরদাসের এই ছেলে অনন্যসাধারণ না হয়ে যায়না।

- তবে সেদিন যে বললে গাঁয়ের সবে জেদী হবে এই ছেলে।

- হবেই তো! জেদ-ই তো বড়মানুষের লক্ষণ।

দুর্গাদেবী চুপ করলেন।

space

বীরসিংহের সকল লোকের মুখেই একটি নাম — 'ঈশ্বর'।

দুরন্ত দামাল ছেলে। তবু সবাই ভালোবাসে তাকে। বাড়িতে থাকেই না বলতে। সারাদিন এ বাড়ি ও-বাড়ি করে বেড়ায়। নয়তো ঠাকুরদার কোলে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। ঠাকুমা ও ঠাকুরদার ও যেন নয়নের মণি। দেখতে দেখতে ঈশ্বরের পাঁচ বছরেরও হলো। এইবার তার হাতে খড়ি দিতে হবে। স্নেহে যেমন, শাসনেও তেমনি কঠিন ছিলেন রামজয়। পাঁচ বছর হতেই তিনি নাতির পড়াশোনার ব্যবস্থা করলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন পাড়াগাঁয়ে স্কুল ছিলনা, ইংরেজী তো পড়ানোই হতোনা। তখন শুধু ছিল পাঠশালা আর টোল। পাঠশালায় বাংলা আর টোলে সংস্কৃত পড়ানো হতো। বীরসিংহ গ্রামে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়-এর একটি পাঠশালা ছিল।

সেই, পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্রকে ভর্তি করে দেওয়া হলো। একটি ঘরের দালায় পাঠশালা। পড়ুয়ারা সব মেঝেতে বসে পড়তো। সকালবেলাতে বসতো বেতখানি গুরুমশাই। সেই মারের ভয়ে কাঁপতো ছেলেরা। মাটিতে রামখড়ি দিয়ে দাগ কেটে কেটে ওদের লেখা শেখানো হলো। নাতিকে ভর্তি করে দিয়ে যাবার সময় রামজয় গুরুমশাইকে বললেন, দেখো কালীকান্ত, ছেলেটার দিকে একটু নজর দিও। বড় জেদী আর একটু দুষ্টুও বটে। তবে বুদ্ধিটা তীক্ষ্ণ।

- আজ্ঞে আপনার নাতি বুদ্ধিমান হবে না তো কে হবে?
- একটু যত্ন নিও ছেলেটার ওপর বুঝলে!
- নিশ্চয়। নিশ্চয়ই নেবো।
- দেখছ কালীকান্ত ছেলেটার মাথাটা কিরকম বড়ো?
- আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি দেখতেই পাচ্ছি। তবে মাথাটা যেন কেমন আকারে একটু বেঁটে।
- এই বড়ো মাথা কিসের লক্ষণ জানো? বিদ্যের লক্ষণ। আমি তোমাকে বলে রাখছি কালীকান্ত, আমার এই নাতি ভবিষ্যতে একজন খুব বড়ো পণ্ডিত হবে।

গুরুমশাই চুপ করলেন। রামজয় ফিরে গেলেন।

space

ছেলেবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র খুবই দুরন্ত ছিলেন।

তাঁর দুষ্টুমিতে প্রতিবেশীরা অস্থির। মাঝে মাঝে ওরা এসে দুর্গাদেবীর কাছে নালিশও করতো। বালকের দুষ্টুমি ছিল নানা রকমের। যখন যাকের

কিংবা বাগানে ঢুকে চুপি চুপি ফল পেড়ে খেতেন; কখনো কেউ বেঁধে রেখেছে ছাগলকে দেখলেই অমনি পা টিপে টিপে গিয়ে ওর বাঁধন খুলে লাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে যেতেন; কখনো বা কারো দাওয়ায় উঠে সেই কাঁঠালী মোয়া ধরে নিয়ে চলে আসতেন। আবার ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ধানের সবুজ শীষ দেখে মনটার মধ্যে জাগত দুষ্টুমির সাধ। দু'হাতে পটাপট সেই ধানের শীষ ছিঁড়ে নষ্ট করতেন। এইরকম সব দুষ্টুমির জ্বালায় পাড়ার লোক, এমন কি গ্রামের লোকও অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। একবার যবের শীষ খেতে গিয়ে খুব বিপদ হয়েছিলেন। গলায় যবের শীষ ফুটে গেল। ছেলে যায় আর কি! ঠাকুরমা তাঁর গলায় আঙুল দিয়ে অনেক কষ্টে সেই শীষ বের করেন। সে যাত্রা উনি বেঁচে গেলেন।

প্রতিবেশীরা আরো অনেক এসে নালিশ করে যায়। দুর্গাদেবী একদিন নিজ স্বামীকে বললেন, নাতির আখেরটা কিরকম হবে, বুঝতে পারছ এখন?

—কেন? বেশ তো পড়াশুনা করছে।

— পড়াশুনা করছে করুক, তার সঙ্গে দুষ্টুমি করে বেড়াচ্ছে। গাঁয়ের লোক যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল ছেলের জ্বালায়।

— ছেলেবেলায় মহাপুরুষেরা অমন একটু দুষ্টুমি করে থাকেন। বড়ো হলে ঠিক হয়ে যাবে। তুমি কিছু ভেবো না গিন্নী।

—তোমার মহাপুরুষই নিয়ে তুমি থাকো, আমি আর বার লোকের নালিশ শুনতে পারি নে।

রামজয় আর তর্ক করলেন না। হঠাৎ ঠাকুরমা-ঠাকুরদাদার খোলার মধ্যে কোণা থেকে দুষ্টুমিভরা চোখে দাঁড়ায় চপল চঞ্চল বালক। রামজয় অমনি তাঁর দুই হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে বুকে তুলে নেন।

পরিচ্ছেদ

এমন যে দুষ্টু ছেলে, কিন্তু পড়াশুনায় ঈশ্বরের অখণ্ড মন। পাঠশালায় প্রবেশের পরে দুষ্টুমির লেশ আর মনে থাকত না। পড়তেন নিবিষ্ট চিত্তে। পাঠশালায় শেখান গুরু তিনি। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সব পড়া হয়ে যেতো। যা একবারেই শিখে ফেলতেন; যা একবার শুনতেন, তাই বুঝে নিতেন আর তখনই তাই মুখস্থ হয়ে গেল। কোনো ছেলেই ঈশ্বরের সঙ্গে পেরে উঠতো না। কালীকান্ত গুরুমশাই এই দেখে বলতেন, হবে না। আর নাতি দেখতে হবে তো।

গুরুমশাইকে খুব ভক্তি করতেন ঈশ্বর। শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর কাছে একরকমই ছিলেন তিনি দেবতার মতো। একে পড়াশুনায় ভালো, তার ওপর ছেলেমানুষ, এইজন্য কালীকান্ত ঈশ্বরকে খুব ভালোবাসতেন। বালকের বুদ্ধি আর মেধাশক্তি দেখে তিনি সময় সময় অবাক হতেন। সকল ছেলেকেই তো পড়াতেন তিনি, কিন্তু ঠিক এমনটি তো আর কাউকে দেখেননি। তাই খুশি হয়ে গুরুমশাই ঈশ্বরকে আদর করে কাছে বসিয়ে মুখে মুখে অনেক নতুন জিনিস শেখাতেন। তারপর সন্ধ্যাবেলায় নিজে কাঁধে করে নিয়ে ঈশ্বরকে ওর ঠাকুরমার কাছে পৌঁছে দিতেন।

ছ'মাস কেটে গেল।

একদিন রামজয় পাঠশালায় এসে জিজ্ঞাসা করেন, কালীকান্ত, ঈশ্বর কি রকম পড়ছে?

- আজ্ঞে, ঈশ্বর খুব ভাল ছেলে। ও বড় হলে খুব বড়লোক হবে।

- তুমিও ঐ কথা বলছ, কালীকান্ত।

বাড়ির ফেরার পথে রামজয়ের বুকটা যেন দশ হাত উঁচু হয়। বাড়িতে এসে ঈশ্বর-জননী ভগবতী দেবীকে বললেন, বৌমা শুনছ, কালীকান্ত বলেছে তোমার এই ছেলে বড়লোক হবে।

লজ্জামুখী বধূ নীরবে শোনেন শ্বশুরের কথা আর মনে মনে আঁকেন ভবিষ্যতের রঙীন ছবি।

পড়াশুনায় যেমন বুদ্ধিমত্তা দেখান আবার গায়ের জোরেও ঠিক তেমনি, সেই ছেলেবেলায় ঈশ্বরের সঙ্গে তার সমবয়সীদের কেউ পেরে উঠত না। তখনকার কালে ফুটবল, হকি অথবা ক্রিকেট খেলা তখন ছিলনা। এসব নাম কেউ শোনেনি। তাই বলে কি খেলাধুলা ছিলনা? তখন কপাটি খেলার খুব চল ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র এই খেলাতে দক্ষ ছিলেন। কপাটি খেলাতে বড় বড় ছেলেদের তিনি সহজেই কাবু করে দিতেন।

তাঁর ছেলেবেলায় গায়ের জোর সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। গ্রামে একটি ডানপিটে ছেলে ছিল। নাম গদাধর পাল। সবাই তাকে ডাকত গদাই বলে। গদাধরের গায়ে খুব জোর। একবার দামোদর পার হতে গিয়ে একখানা নৌকো ডুবে যায়। গদাই তীরে দাঁড়িয়েছিল। সে ঝপ করে জলে ঝাঁপ দিয়ে

দুজন তুখড় লোককে দু'বগলে ধরে সাঁতার কেটে ডাঙায় উঠলো। এমন দুর্দান্ত শক্তিশালী সর্দার যখন কুস্তি খেলায় নামতো, ঈশ্বর তাকেও অনায়াসে ধরে চিৎ করে ফেলতে পারতেন, আর ওর বুকের ওপরে চড়ে বসতেন। সবাই দায়ে পড়ে হতো আর বলতো, ঈশ্বরের সঙ্গে আর পারার উপায় নেই।

দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে গেল।

পাঠশালার পড়া শেষ হলো। এই সময়ে ঠাকুরদাস একদিন কলকাতা থেকে দেশে এসেছেন। কালীকান্ত তাঁকে বললেন, আমার যত যা-কিছু শিখবার, ঈশ্বর তা সবই শিখে ফেলেছে। এবার ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ইংরেজী লেখাপড়া শেখান। আপনার ছেলের যে রকম বুদ্ধি, তাতে ও একদিন মস্ত বিদ্বান হবে।

কিন্তু এটুকু ছেলে ঠাকুরমাকে ছেড়ে, মাকে ছেড়ে যাবে কি করে? ঠাকুরমা তো ঈশ্বর বলতে অজ্ঞান। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুরদাস, বাবা, আপনি কি বলেন?

—কালীকান্ত ঠিকই বলেছে। ঈশ্বরকে এখন তোমার কাছেই রেখে লেখাপড়া শেখাও। বললেন রামজয়। কিন্তু দুর্গাদেবী আপত্তি করলেন এই বলে, কলকাতায় না গেলে কি মানুষ হবে না?

—না, তা হয় না। এখানে লেখাপড়া শিখবার স্কুল কোথায়?

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হলো। ন'বছরের ছেলে ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে ঠাকুরদাস এক শুভদিনে গেলেন কলকাতায়। সঙ্গে আছেন মাস্টারমশাই কালীকান্ত।

—

।। চার ।।

ঠাকুর মা ও মা দুজনেই সজল নয়নে বিদায় দিলেন ঈশ্বরকে।

নাড়ি-ছেঁড়া ধন দুর্গাদেবীর, সেইজন্য কষ্টটা তাঁরই বেশি হলো। কষ্ট আরো এইজন্য যে নাতিকে দণ্ডে দণ্ডে না দেখলে তাঁর কষ্টের সীমা থাকবে না। আর ভগবতী দেবী? ঈশ্বর তাঁর প্রথম সন্তান, তাকে ঘিরেই তো মা মনে মনে রচনা করেন তাঁর ভবিষ্যৎ। ছেলে কলকাতায় গিয়ে ভালো করে লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক — এটাই তো তিনি কামনা করলেন মনে মনে। শুভদিনে দুর্গানাম স্মরণ করে, বাবা ও মাকে প্রণাম করে ঠাকুরদাস ঈশ্বরকে নিয়ে যাত্রা করলেন।

বীরসিংহ থেকে কলকাতা কম রাস্তা নয়। বাহান্ন মাইল। তখন রেলগাড়ি হয়নি। লোকে পায়ে হেঁটে কিংবা ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া-আসা করতো। আটবছুরে ছেলে অতখানি পথ হেঁটে যেতে পারবে কিনা, এই ভেবে দুর্গাদেবী একজন চাকরকে সঙ্গে দিলেন। দরকার হলে ঈশ্বরকে সে কাঁধে করে নিয়ে যেতে পারবে। পথে কদিন লাগবে কে জানে? নৌকোতে যাওয়া যাবে, তাও ভালো না। তাতে নানা বিপদের ভয়। চোর-ডাকাতের ভয়, নৌকো ডুবে যাবার ভয়, ঝড়ের ভয়। তাই ঠাকুরদাস হাঁটাপথেই চললেন।

আর যখন আমরা কল্পনা করি — ন বছরের ছেলে তাঁর বাপের হাত ধরে পায়ে হেঁটে চলেছেন কলকাতায়, তখন আমাদের মন বিস্ময়ে ভরে ওঠে। বেশির ভাগ রাস্তা তিনি হেঁটেই চললেন। চাকরটাও ও ঠাকুরদাস তো ছেলের উৎসাহ দেখে অবাক। যখন হাঁটতে হাঁটতে পা দুটি ভারী হলো, বালক ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তখন সঙ্গের চাকরটি তাঁকে

কাঁধে তুলে নিলো। তিন দিন একটানা পথ চলবার পর তাঁরা এসে উঠলেন বাঁধা সড়কে। এখান থেকে পাকা রাস্তা কলকাতা পর্যন্ত। নিজের গ্রাম, খেলার সাথী-সাথী, মা আর ঠাকুরমা-ঠাকুরদাকে ছেড়ে বিদেশে যেতে ঈশ্বরের মন কেমন করছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে নতুন জায়গা দেখতে দেখতে আবার একটা আনন্দও ছিল। সাথের বাঁধা রাস্তা দিয়ে চলেছেন ঠাকুরদাস। এখান থেকে শহর কলকাতা আর বেশি দূরের পথ নয়। পথে তৃষ্ণা পেলো। সঙ্গে করে যেটুকু জল আনা হয়েছিল তা ফুরিয়ে গেছে। সময়ে তৃষ্ণায় কাতর হয়। ঠাকুরদাস অস্থির হলেন, কোথায় জল পাওয়া যায়। হঠাৎ নজরে পড়লো একজন লোক ঝাঁকায় করে তরমুজের বোঝা নিয়ে চলেছে। শেষে ঠাকুরদাস একটা কিনলেন তিন পয়সা দিয়ে। তবে মিষ্টি ও ঠান্ডা তরমুজ খেয়ে ঈশ্বরের তৃষ্ণা দূর হয়।

এবার বাঁধা রাস্তা দিয়েই চলেছেন তাঁরা।

— বাবা, ওটা কি?

— কোনটা?

— ঐ যে ঐ বাটনা বাঁটা শিল পোঁতা রয়েছে।

— দূর বোকা ছেলে, ওটা বাটনা বাঁটা শিল হবে কেন? ওটা মাইল-স্টোন।

— মাইল-স্টোন কি বাবা? কৌতূহলী বালকের আবার প্রশ্ন।

— মাইল-স্টোন হলো ইংরেজী কথা। মাইল হলো আধ ক্রোশ রাস্তা আর স্টোন মানে পাথর। এই রাস্তায় আধক্রোশ অন্তর একটা করে এই রকম পাথর পোঁতা আছে। আর তাতে 1, 2, 3 — মানে ১, ২, ৩ এই রকম অঙ্ক পরপর লেখা আছে। একটা

মাইল-স্টোন দেখিয়ে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করে, এই পাথরটার গায়ে কত অঙ্ক লেখা আছে, বাবা?

— উনিশ। এর মানে এখান থেকে কলকাতা উনিশ মাইল পথ।

এই বলে ঠাকুরদাস ঈশ্বরকে পাথরটার কাছে নিয়ে গিয়ে চোখে ধরে দেখালেন। বাংলাতে ঈশ্বর শিখেছিলেন একের পিঠে নয় — উনিশ। বললে আবার প্রথম অঙ্কটার ওপর হাত দিয়ে বলে উঠলো, বাবা, এটা তবে ইংরেজীর ১। এরপর ৯ অঙ্কের ওপর আঙুল রেখে বলে, আর এটা তবে হলো ইংরেজীর ৯।

ছেলের বুদ্ধি দেখে ঠাকুরদাস ভারি খুশি। বললেন, ঠিক বলেছিস।

ঈশ্বরেরও মহা ফুর্তি। সালকে থেকে যেতে যেতেই পথে একটির পর একটি মাইল-স্টোন দেখে সবকটা ইংরেজীর 1, 2, 3 অঙ্কগুলি সব চিনে ফেলেছিল। এই দেখে কালীকান্ত চাটুজ্যেমশাই ঠাকুরদাসকে বললেন, আমি বলছি, তোমার ছেলে সময়ে একজন খুব বিদ্বান হবে।

space

শহর কলকাতা। আজকের দিনের সঙ্গে সেদিনের কলকাতার এই চেহারা ছিলনা। কোন রাস্তায় না ছিল ইলেকট্রিকের আলো, না চলতো ট্রাম, বাস। মোটর গাড়ি, সে ছিলই না। কলের জলও নয়। দালানকোঠা বাড়িও ছিলনা। এত গাড়িঘোড়া, লোকজন আর দোকান ছিল না। নামেই শহর। তখন সন্ধ্যাবেলা হলেই পল্লীগ্রামের মতো শহরের চারদিকে অন্ধকারে ভরে যেত। কলকাতা ইন্দ্রপুরী ছিল তখন জঙ্গলের মধ্যে। শহরের চারদিকে বন-জঙ্গল। শহরের ভেতরে নালা-নর্দমা, ডোবা পুকুর আর

বনজোম। তখন এখানে দিনে-দুপুরে শেয়াল ডাকতো। আর মশা-মাছির তো অভাবই নেই। 'রেতে মশা, দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি' — এই ছিল শহরের চেহারা।

বড়বাজারে দয়েহাটায় যে বাড়িতে ঠাকুরদাস থাকতেন সেই বাড়িতেই এসে উঠলেন তিনি ছেলেকে নিয়ে। তখন সিংহ মশাইয়ের ছেলে জগৎদুর্লভ বাবু এই বাড়ির কর্তা। বয়স কুড়ি পঁচিশ হবে। ঠাকুরদাসকে তিনি 'খুড়ো' বলে ডাকতেন। সেই সুবাদে ঈশ্বর তাঁকে দাদা আর তাঁর বোন রাইমণিকে দিদি বলে ডাকতেন। মা ও ঠাকুরমাকে ছেড়ে এসে অবধি ঈশ্বরের মনটা ভালো ছিল না। রাইমণির আদর-যত্নে মনের সে ভার কিছুটা শান্ত হয়। তবু কলকাতা যেন তার মোটেই ভালো লাগলো না। মায়ের জন্য মন কেমন করে, ঠাকুরমার জন্য মন ছটফট করে। বীরসিংহের সঙ্গী সাথীদের জন্যও মন কেমন করে।

কলকাতার জল-হাওয়া সহ্য হলো না। এখানে আসার কিছুদিন পরেই ঈশ্বরের পেটের অসুখ করলো। এমন অসুখ হলো যে কিছুতেই আর সারে না। খবর পেয়ে দেশ থেকে ছুটে এলেন ঠাকুরমা। অসুখ সেরে উঠলেই নাতিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বীরসিংহে ফিরলেন। ওকে আর কলকাতায় রেখে পড়াবার মত নেই তাঁর। তখন ঠাকুরদাস বললেন, তা কি হয় মা। বাবা যে বলে গিয়েছেন—

আর বলতে হয় না ঠাকুরদাসকে। অমনি স্বামীর কথা মনে পড়ে। এই নাতিটি সম্বন্ধে তাঁর জ্যোতিষী স্বামীর কথা মনে হতেই দুর্গাদেবী আর আপত্তি করেন না। পাঁচ-ছ মাস পরে ঠাকুরদাস আবার ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। এইবার থেকে

মজুরে খাটি করতে হত। সংসারে দারিদ্র্যের জন্য তিনি নিজে লেখাপড়া শিখতে পারেন নি। তাই ঠাকুরদাস সেই ক্ষোভ মেটাতে চাইলেন ঈশ্বরকে লেখাপড়া শিখিয়ে। মাইনে তখন মোট দশটি টাকা। বন্ধুরা বললেন, ঠাকুরদাস পারবে কি তুমি ছেলেকে এখানে রেখে পড়াতে?

— নিশ্চয়ই পারবো। তবে আমি হিন্দু কলেজে পড়াবো।

বন্ধুরা শুনে অবাক হন। গরীব মানুষের সাধ তো কম নয়। যেন বামনের চাঁদে হাত দেওয়ার মতো। হিন্দু কলেজে পড়াতে চান! ওখানে বড়লোকের ছেলেরা ছাড়া আর কেউ পড়তে পায় না।

— তাছাড়া দশটাকা মাইনে, ও ছেলেকে পড়াবে কি করে?

— কেন ঈশ্বরের জন্য আমি আধপেটা খেয়ে থাকব, [illegible] আর বাকী টাকা দিব ছেলের লেখা পড়ার খরচের জন্য।

— উঁচু টাকায় হিন্দু কলেজে পড়ানো সহজ। তোমার কি ইচ্ছে তাহলে হলো। [illegible] ছেলেকে দেবে কিসে ঐ ইংরেজী স্কুলে, বললেন একজন শুভাকাঙ্খী আত্মীয়।

— তার চেয়ে ছেলেকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দাও, উপদেশ দিলেন আর একজন।

দ্বিধায় পড়লেন ঠাকুরদাস। কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না। সেকালের দিনে কলকাতায় এত স্কুল-কলেজ ছিল না — লেখাপড়ার এমন ঢালাও ব্যবস্থাও ছিল না। কেবল সাহেবদের স্কুল, হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ আর ডাফ সাহেবের স্কুল — এই দুই চারটি ভালো স্কুল ছিল। তাছাড়া দু'একজন মাস্টার তাঁদের বাড়িতে স্কুল

খুলেছিলেন। সেখানে বাংলায় শুধু ইংরেজী পড়ানো হতো। সংস্কৃত কলেজে শুধু সংস্কৃত পড়ানো হতো। ছেলেদের দিয়ে যে যত বেশি ইংরেজী কথা বলতে পারবে তাকে তত বেশি বিদ্বান বলে গণ্য করা হবে এবং সরকারি-দপ্তরেও সুবিধা হবে।

শেষ পর্যন্ত ঠাকুরদাস ছেলেকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দিলেন। নামেই কলেজ, আসলে পাকা বাড়িতে একটা টোল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। গোলদীঘির ধারে পাশাপাশি হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ। তখন সংস্কৃত কলেজে চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্ররা সবাই মাদুরের উপর বসে টোলের ঢঙে পড়তো। পণ্ডিতমশাইরা আলাদা আসনে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসে ছাত্রদের পড়াতেন। তাঁদের কাছে নস্যের ডিবের মতো থাকতো নস্যি। এই স্থান স্থান মধ্যের মতো দিতেন পড়াতেন। মাথায় টিকিদের দুলতো লম্বা টিকি। যখনো তখনো আসনে বসেই দিব্যি ঘুমিয়ে নিতেন কিছুক্ষণ।

সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

তখন কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল যে একদিন এই বিদ্যা-নিকেতনের সেরা ছাত্র হয়ে তিনি লাভ করবেন 'বিদ্যাসাগর' উপাধি আর নিযুক্ত হবেন এখানকার অধ্যক্ষ? ঈশ্বর সংস্কৃত শিখে পণ্ডিত হবে, আর দেশে ফিরে টোল খুলে বসবে — এই ছিল ঠাকুরদাসের মনের ইচ্ছা। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। শুরু হলো ছেলেবেলায় ঈশ্বরচন্দ্রের গৌরবময় ছাত্রজীবন যার কোন তুলনা মেলেনা আমাদের দেশে। সেই ছাত্রজীবনের শুরুতেই ঠাকুরদাস ছেলেকে বলে দিয়েছিলেন: মন দিয়ো। ধনে মানে — 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে' — কথা ক

ছিলেন তাঁর নিজের দেশে, কিন্তু বিদ্যালয়ের সুনাম সব দেশে। কথাটি তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল। মনের মতো শিক্ষক আর নিজের অধ্যাপকের মধ্যে ছাত্রটিকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখিয়েছিলেন, তা জানলে অবাক হতে হয়।

ব্যাকরণের ক্লাসে ভর্তি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

তখন সংস্কৃত কলেজে বহু নাম-করা অধ্যাপক। এক-একজন যেন বিদ্যার সাগর — কেউ ব্যাকরণের পণ্ডিত, কেউ সাহিত্যের, কেউ দর্শনের। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ব্যাকরণ পড়াতেন। জীবনে তিনি অনেক ছাত্র পড়িয়েছেন, কিন্তু এমন মেধাবী ছাত্র তিনি আর দুটি দেখেন নি। স্মৃতিশক্তির যেন বিস্ময়ের সৃষ্টি। যা শোনে তাই মনে থেকে যায়। আর লেখাপড়াতে কি অসম্ভব মনোযোগ। প্রথম থেকেই তর্কবাগীশ দৃষ্টি রাখলেন ঈশ্বরের ওপর। ছ'মাস পরে একটা পরীক্ষা হলো। ঈশ্বর সেই পরীক্ষায় প্রথম হলেন এবং পাঁচ টাকা বৃত্তি লাভ করলেন।

ঠাকুরদাস খুশি হলেন।

এটাই তো চেয়েছিলেন তিনি। ছেলেকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, খুব মন দিয়ে পড়বি, বাবা। মনে রাখবি শাস্ত্রের উপদেশ — বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।

প্রথম প্রথম ঠাকুরদাস ঈশ্বরকে সঙ্গে করে কলেজে নিয়ে যেতেন; ছুটির পর সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। বড়বাজার থেকে বৌবাজার (কলেজ স্ট্রীট) বেশ খানিকটা পথ হেঁটে আসতেন। ঠাকুরদাস একলা ছেলেকে ছেড়ে দিতেন না। পাছে সে শহরের আবহাওয়ায় অসৎ সংসর্গে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়, সেইজন্য ঠাকুরদাস সর্বদা তাঁর ছেলের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। যখন তিনি বুঝলেন, ঈশ্বর একলাই পথ চলতে পারবে

এই ফলটা খেলে কোনো ক্ষতি হবেনা, এমন বলে ছেলেদের তিনি ফলটা খেতে দিলেন।

ঐ সময়ে ঈশ্বর দেখতে খুব ছোট ছিলেন। মাথাটা ছিল বেশ মস্তবড়। ছাতাটি মাথায় দিয়ে যখন তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে পড়তে যেতেন, তখন দূর থেকে দেখে বোঝবার উপায় ছিলনা যে, ছাতা চলেছে কি একটি ছেলে চলেছে। মাথা বড়ো ছিল বলে পাড়ার ছেলেরা তাঁকে 'যশুরে কৈ' বলে ঠাট্টা করত। যশোরের কৈ মাছ বিখ্যাত — সেই মাছের মাথা খুব বড় হয়। ঈশ্বর চটে লাল হতেন। সেই সময়ে তিনি আবার একটু তোতলাও ছিলেন। রেগে গেলে তাঁর মুখ দিয়ে শুধু বেরোত 'তো-তো' শব্দ। ছেলেরা এই শুনে আনন্দে হাসাহাসি করত। সেই ছেলের যশুরে-কৈটির পাত্র যখন দু'মাস পরে পরীক্ষায় সকলের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে জলপানি পেলেন, তখন তারা রীতিমতো বিস্মিত হল।

স্কুল থেকে ফিরলে ঠাকুরদাস ছেলেকে পাশে বসিয়ে সব জিজ্ঞাসা করতেন। ঠিকঠিক বলতে না পারলে বাবার হাতে মার খেতেন। তিনিও ঈশ্বরের মতো পণ্ডিত ছিলেন। লেখাপড়ায় একটুও ত্রুটি সইবার লোক ছিলেননা। যদি কোনো দিন রাতে পড়তে পড়তে ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে কিশোরের চোখ দুটো বুজে আসত অথবা যদি তিনি পড়তে পড়তে কোনদিন ঘুমিয়ে পড়তেন, তাহলে আর নিস্তার ছিলনা। ঘুমন্ত ছেলের পিঠের ওপর চড়-চাপড় পড়ত। ঈশ্বর কেঁদে উঠতেন। ঘরের ভেতর থেকে অমনি ঠাকুমা ছুটে আসতেন। ঈশ্বরকে দুই হাত দিয়ে বুকে চেপে ধরে বলতেন, আহা, ও যে ছেলেমানুষ। ওকে মারছিস কেন?

[redacted] এই ঠাকুমার থেকে ঈশ্বর দয়ার শিক্ষাটা তুলে নেন।

॥ পাঁচ ॥

একদিন ঠাকুরদাস তাঁর ছেলেকে বললেন, ওরে, আজকে আর স্নান করতে হবে না।

—না বাবা, আজকেই স্নান করতে হবে।

এই বলে তেল মেখে গঙ্গার দিকে চললেন ঈশ্বরচন্দ্র। বাবা যত বলেন, না, আর স্নান করার দরকার নেই, ছেলে ততই বলে, হ্যাঁ, আজকেই স্নান করব। আবার আর একদিন ঠাকুরদাস বলেন, চলরে ঈশ্বর, গঙ্গা থেকে স্নান করে আসি, সেদিন ছেলে ঠিক উল্টো কথা বললে, উঁহু, আজ আর আমি স্নান করব না।

এমনি জেদী ছিলেন তিনি। যদি একবার 'না' বলেছেন, তবে সহজে তাঁকে রাজী করিয়ে নিয়ে যাওয়া সাধ্যি ছিল না ঠাকুরদাসের। শেষে হয় ভয় দেখিয়ে, নয়তো জোরে, না হলে কিছু উল্টো কথা বলে সে কাজে হতো। ফিরে আসাটাকে বাড়ি জেদের জন্য খুব কষ্ট।

ছোটো থেকে ঈশ্বরচন্দ্র খুব রেঁধে খেতেন যে, [redacted] এমনকি তাঁকে রান্না আর সারাদিনের সেবা করতে হতো। তখনও অত ছোট সমস্ত হয়েছে যে, ঠাকুরদাস ছেলেকে ধরে গঙ্গার ঘাটে নামিয়ে দিতেন, কিন্তু বেশী জলে দাঁড়িয়ে থাকতে, একটু কিছুতেই ডুব দিতেন না। শেষে অনেক সাধ্যসাধনার পর জোর করে তাকে স্নান করাতে হতো। স্নানের বেলায় যেমন, জামা-কাপড় পরার ব্যাপারেও ঠিক তাই। যেদিন ঠাকুরদাস বলতেন, ওরে, আজ একখানা খুব পরিষ্কার কাপড় পরবে, বুঝলে যা, ঈশ্বর অমনি মনে মনে ঠিক করতেন যে, সেদিন সে একখানা ময়লা কাপড় পরেই স্কুলে যাবে। বাবাকেও ঠিক তাই করতো। এইজন্য মাঝে মাঝে

ঠাকুরদাস হেসে দিয়ে বললেন, বাবা কি ~~▪~~ অমনি অমনি কেঁদে উঠে?
ঠাকুর বলেছিলেন।

ঠাকুরদার কথা মনে পড়লেই ঈশ্বরচন্দ্র ^অমনি শান্ত হয়ে যেতেন।

এভাবে নয় বছর বয়সে ঈশ্বরের ব্যাকরণ পড়া শেষ হলো।

তারপর তিনি ঢুকলেন সাহিত্যের শ্রেণীতে।

এই সময়ে ঠাকুরদাস ছেলের বিয়ে দিলেন। বিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু স্কুলের ছেলের যা নিত্য কর্ম — সেই নিয়ে বেশ আমোদ করা — এ সব, এসব তিনি করলেন না। সংস্কৃত কলেজের কম দূরে থেকে, স্কুলের ছেলে হয়ে তিনি ছেলেবেলা থেকেই কোনরকম ঠাকুরদেবতার পূজো করা পছন্দ করতেন না। তাঁর কাছে ^সংসারে প্রত্যক্ষ দেবতা ছিলেন মাত্র দুজন — মা আর বাবা। সারা জীবন তিনি এঁদের পূজা করেছেন সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে। বলতেন, সংসারে প্রত্যক্ষ এঁরাই একমাত্র জীবন্ত দেবতা। আমি অন্য দেবদেবী জানিনা, মানিনা।

পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।

সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক। নিজে পণ্ডিত। এতটুকু ছেলে সাহিত্য পড়বে — এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেই পারলেন না। এতটুকু বয়সের ছেলে সাহিত্যের শ্রেণীতে কী পড়বে। এই নিয়ে আপত্তি করলেন। ওঁর মতে, এইটুকু বয়সের ছেলে সংস্কৃত সাহিত্য বুঝতে পারবে না। ঈশ্বরের অভিমান হলো। তিনি বললেন, আগে আমাকে পরীক্ষা করে নিন।

তর্কালঙ্কার মশাই তো এই কথা শুনে অবাক।

শুধু পরীক্ষা করে নেওয়া নয়, সেই সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র একথাও বললেন যে, যদি তিনি পরীক্ষায় পাশ করতে না পারেন, তাহলে তিনি সংস্কৃত কলেজ পড়া ছেড়ে দেবেন। কলেজ ছেড়ে দেব! এমন কথা তো কোন ছাত্রের মুখে শোনেনি। কৌতূহল হলো তাঁর। পরীক্ষা করলেন। ভট্টিকাব্য থেকে বেছে বেছে কয়েকটা কঠিন শ্লোকের মানে করতে দিলেন। বড় বড় অধ্যাপকেরা ঠিক যেভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন, তাদের চেয়েও ভালো ব্যাখ্যা করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। অধ্যক্ষের খুব সন্তুষ্ট হলেন। বুঝলেন, এ সত্যিই একজন মেধাবী ও প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র— এমন ছাত্র এখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি। আর আপত্তি নেই। তিনি তাঁকে সাহিত্যের শ্রেণীতে নিলেন।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের দুষ্টুমি কমে গিয়েছে। কিন্তু জেদটা আছে পুরোমাত্রায়। সব জেদটা এখন তাঁর পড়ালেখার ওপর। প্রায় সারা রাত জেগেই তিনি লেখাপড়া করতে শুরু করলেন। [illegible] সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। তারপর শুতে যেতেন। শুতে যাবার সময় বাবাকে বলে রাখতেন দু'ঘণ্টা পরে জাগিয়ে দিতে। (আর্মানি) আছেই গির্জার ঘড়িতে যেই ঢং ঢং করে বারোটা বাজতো, অমনি ঠাকুরদাস ছেলেকে জাগিয়ে দিতেন। চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বাকী রাতটা পড়ে কাটিয়ে দিতেন। সত্যি, লেখাপড়া ছিল তাঁর কাছে তপস্যার মতো।

শুধু কি লেখাপড়া? এই সময়ে কলকাতায় এসেছেন তাঁর মেজ ভাই দীনবন্ধু। তিনিও সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়েছেন। ঠাকুরদাসের অল্প মাইনে। সবার

কোন ঝি-চাকর ছিল না, রাঁধবার লোকও ছিল না। দু'বেলা রান্নার কাজটা নিজেকেই করতে হত। শুধু ঝি-চাকর? এইসময় তাঁর দৈনন্দিন কাজের রুটিন ছিল এই রকম: ভোরবেলায় ওঠা। ঘন্টাখানেক পড়া। তারপর স্নান করা। স্নান করে ফিরবার সময় বাজার করা। নিজের হাতে তরকারী কোটা, মসলা বাঁটা, উনুন ধরানো, এমন কি উনুন ধরাবার জন্য কাঠ চেলা করা। মাঝেমধ্যে ওঁর বাজার লোক পার-পাক করে। উনুন ধরিয়ে রান্না করতেন আর রান্নার ফাঁকে ফাঁকে পড়তেন। রান্না হয়ে গেলে খাওয়া দিয়ে সকলের শেষে খেতেন। তারপর এঁটো পরিষ্কার করা, বাসন মাজা, সবশেষে ধুয়ে-মুছে রেখে কাজের শেষ হত তাঁর। তখন আবার কিছুক্ষণ পড়বার সময় পেতেন। তারপর কলেজে যেতেন। পথে যেতে যেতে পড়ার নিয়ম ছিল। তবে এঁর ছেলেবেলায় তাঁকে বীরু ভেতো বলে শোনা যায়নি।

এত পরিশ্রম, কিন্তু তার উপযুক্ত খাওয়া-দাওয়া ছিল না তাঁর। অনেকদিন বেলা করে খেতেই পেতেন না। ঝি-চাকর যে তাঁর দুজনেরই ছিল না আটকে তা তোমরা কল্পনাই করতে পারবে না। শুনলে ঠিক যেন রূপকথার মতো লাগে। কোনোদিন ভাত জুটতো, কোনোদিন জুটতো না। যেদিন জুটতো সেদিন খাবার পেট ভরে খেতে পেতেন না। যেদিন পেটের ভাত জুটতো সেদিন খাবার তরকারী জুটতো না—শুধু নুন দিয়ে ভাত খেতে হত। আর একবারে যদি হত কোনোদিন, সেদিন একবেলা খালি জলখাবার, একবেলা না শুধু জলকাদিতে, একবেলা না খেয়ে—এই রকম হিসেব করে চালিয়ে নিতে হত। এর মাঝে-ও দিন হলে খাবার আরও কমিয়ে দিতে হত।

#space#

সাহিত্যের শ্রেণীতেও প্রথম হলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

বছরের পরীক্ষা হলো, এবার অলংকারের পালা। সকল ছাত্রদের পেছনে ফেলে তিনি এগিয়ে গেলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের যত কঠিন কঠিন বই — রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, মেঘদূত, উত্তররামচরিত, কাদম্বরী — সবই তাঁকে পড়তে হয়েছিল। আর সে কি যেমন তেমন করে পড়া, একেবারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া। পড়া নয় — অধ্যয়ন। এসব বই তাঁর অধ্যাপকের মুখস্থ ছিল। সাহিত্য ক্লাসের শেষ পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র খুব কৃতিত্ব দেখালেন। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের আর গর্বের শেষ নেই। এখন ঈশ্বরচন্দ্র [redacted] সুন্দরভাবে অনর্গল সংস্কৃত বলতে পারেন, মুখে যেন খই ফুটছে। উচ্চারণদোষ আর নেই। শুধু কি বলা — বিতর্ক করতে শিখেছেন।

দেশে ফিরলেন ঈশ্বরচন্দ্র। সকলের আগে কালীকান্ত তর্কবাগীশের কাছে গেলেন। তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। তিনি আশীর্বাদ করলেন। আজ তাঁর ছাত্র কলকাতার ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে — এ গর্ব যে তাঁরই। এখন আসরে ছাত্রের সঙ্গে আলোচনায় তাঁর নিমন্ত্রণ হয়। সভায় পণ্ডিতদের মধ্যে কিশোর ঈশ্বরচন্দ্র বিচারে প্রবৃত্ত হন। লোকে দেখে অবাক হয়। ছেলে-মুখে যেন প্রবীণের বিদ্যুৎ-চমক। হাঁ, বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে বটে রামজয়ের নাতি, সবাই বলে সবিস্ময়ে। আশেপাশের গ্রামে নাম ছড়িয়ে পড়ল। মেদিনীপুর, বর্ধমান ও হুগলী জেলার ঘরে ঘরে পণ্ডিতদের সমাজে ঠাকুরদাসের ছেলে ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যার যশ ছড়িয়ে পড়ল।

ঠাকুরদাস এই সময়ে ঈশ্বরকে নিয়ে একবার দেশে এলেন। ভগবতী দেবী

স্বামীকে বললেন, ঈশ্বরের এখন বিয়ে দাও।

— এই বয়েসে বিয়ে কি? তাহলে যে ওর পড়াই শেষ হবেনা।

— আর কত পড়াবে? লোকে যে বলে ঈশ্বর খুব পণ্ডিত হয়েছে।

— এখনো পড়ার অনেক বাকী, সে তুমি বুঝবেনা। অলঙ্কার পড়বে, ন্যায় পড়বে, স্মৃতি পড়বে, তবে তো।

কিন্তু ভগবতী দেবী নিরস্ত হলেন না।

তখন ঈশ্বরের বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। অতটুকু বয়সে ছেলের বিয়ে দেবার খুব ইচ্ছে ছিলনা ঠাকুরদাসের। তবু স্ত্রীর অনুরোধে তিনি ছেলের বিয়ে দিলেন। ক্ষীরপাই গ্রামের শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের মেয়ে দীনময়ীর সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের বিয়ে হয়ে গেল একদিন শুভ লগ্নে। দীনময়ীর বয়স তখন আট বছর। যেমন সুলক্ষণা, তেমনি সুন্দরী। ঘর-আলো করা বৌ। বিয়ের পর ঈশ্বর আবার কলকাতায় ফিরলেন।

এবার অলঙ্কার।

এই ক্লাসের অধ্যাপক ছিলেন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ। শুধু অলঙ্কার নয় ব্যাকরণ ও সাহিত্যেও তিনি একজন বড়ো পণ্ডিত ছিলেন। উঁচু ক্লাস, কঠিন কঠিন বই। সেসব বই পড়তে ও বুঝতে ঈশ্বরচন্দ্রকে রীতিমতো পরিশ্রম করতে হলো। বার্ষিক পরীক্ষায় সকলের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে তিনি প্রথম হলেন। তর্কবাগীশ বুঝলেন, এ ছাত্র সাধারণ ছাত্র নয়। এই সময়ে ঈশ্বরের খুব কঠিন অসুখ করলো। একে পরীক্ষার জন্য কঠিন পরিশ্রম, তারওপর বাসায় সব রকম কাজের ভার ছিল তাঁর ওপর — অতটুকু

শরীরে এত পরিশ্রম সহ্য হবে কেন? তাই এই সময়ে চিকিৎসার জন্য তাঁকে কিছুদিন বীরসিংহে গিয়ে থাকতে হয়েছিল।

অলঙ্কারের শেষ পরীক্ষায় ঈশ্বর সকলের ওপরে গেলেন। কলকাতায় পেলেন অনেক টাকা; সেরা ছেলে বলে পুরস্কার পেলেন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র সবাই ঈশ্বরের সবার গুণে প্রশংসা। সকলের মুখেই তাঁর নাম, সকলের চোখই তাঁর ওপর। শুধু যে লেখাপড়াতেই সেরা ছাত্র তা নয়, সেই সঙ্গে (দয়া তাঁর মনে) অনেক ছেলের অনেক সময়ের অভিভাবক পাওয়া সত্ত্বেও। তিনি প্রাণপণ যত্নে তাঁর বাপ-মায়ের সেবা করতেন — সেবার জন্যেও তাঁদের বড়ো বলে মানতেন। ছোট ভাই-বোনদের স্নেহের চোখে দেখতেন। রোগীর কাছে বসিয়ে নিজে খাবার খেতেন। গরিবের দুঃখে একটু কিছু হলে তিনি আকুল হতেন।

এই সময়কার একটা ঘটনা। একদিন দীনবন্ধুকে সন্ধ্যার সময়ে তিনি বাজারে পাঠালেন। রাত একটা বেজে গেল, তখনো দীনবন্ধু ফিরল না। দেখে ঈশ্বরের বুক ভয়ে ও ভাবনায় ভরে গেল। ভাইয়ের জন্য তিনি কাঁদতে লাগলেন। সে কী কান্না! তখন এক লণ্ঠন হাতে ভাইকে খুঁজতে তিনি গেলেন বাজারে। কোথাও খোঁজ পেলেন না। আরো ভয় হল। তারপর থেকে গেলেন চিৎপুরের দিকে। সেখানে খুঁজতে খুঁজতে দেখেন একটা বাড়ির দোকানে হেলান দিয়ে সে ঘুমিয়ে আছে। সেখান থেকে দীনবন্ধুকে নিয়ে তিনি বাসায় এলেন।

শুধু আত্মীয় নয়, গরিবের কাঙালদের প্রতিও তাঁর দয়ার প্রকাশ পাওয়া যেতে লাগল এই সময় থেকেই। যে দয়া-মায়া দিয়ে ভগবান তাঁকে এই সংসারে

পালিয়েছিলেন, এখন থেকেই লোকে ধীরে ধীরে তার পরিচয় পেতে লাগল। নিজের ছেলে বলতে, কিন্তু যদি দেখতেন, কেউ কষ্টে পড়েছে, তখন যেমন করে হোক তার উপকার করতেন। যদি দেখতেন প্রতিবেশীর অসুখ করেছে শুনতেন, অমনি ছুটে গিয়ে তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন ও যতদূর তার ওষুধ-পথ্য জোগাতেন। যে ছেলের বই নেই, নিজের উপার্জনের টাকাকড়ি থেকে তাকে বই কিনে দিতেন, যার কাপড় নেই, তাকে কাপড় কিনে দিতেন। নিজে তিনি খদ্দরের মোটা ধুতি আর মোটা চাদর পরে স্কুলে যেতেন। এই সময় ভগবতী দেবী ছেলের জন্য নিজের হাতে-কাটা সুতো দিয়ে ধুতি বুনিয়ে পাঠাতেন।

ছাত্র অবস্থায় কলেজে যদি কোনোদিন একটু টিফিন খেতেন, তবে সবাইকে ভাগ করে খেতেন. তাদেরও যত্ন করে খাওয়াতেন। ভবিষ্যতে তিনি একদিন দয়ার সাগর নামে বিখ্যাত হলেন. তাঁর ছাত্রজীবনেই তাঁর মধ্যে এইসব গুণের বিকাশ দেখে লোকে আশ্চর্য হয়ে যেত। তবে তিনি যেটা ঠিক বলে ভাবতেন, তিনি নিজের মত সেটাই করতেন। কলকাতায় যখন থেকেছেন, তখন সেখানে গিয়েও প্রতিবেশী সমবয়সী ছেলেদের খোঁজখবর নিতেন। কেউ কষ্টে পড়েছে শুনলে, সাধ্যমত তার উপকার করতেন। গ্রামের লোকেরা তখন থেকেই ঈশ্বরচন্দ্রকে 'দয়াময়' বলতে শুরু করেছে। তারা বলতো, হবে না, বংশের ধারা। ঠাকুরদা পণ্ডিত ছিলেন দেবতা। দেবতার ঘরেই তো দয়াময় আসবে।

এইসব কথা শুনতেন আর মুগ্ধ গর্বে ভরে উঠতো ভগবতী দেবীর বুকখানা।

Space

ঠনঠনিয়ার চৌরাস্তার মোড়ে তারানাথ তর্কবাচস্পতির বাড়ি। মস্ত বড় পণ্ডিত তিনি। তাঁর বাসায় ঈশ্বরচন্দ্র প্রায়ই যেতেন কলেজের ছুটির পর। সেখানে তখন আরো অনেক ছাত্র আসতো। ওদের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা হতো তাঁর। একদিন সন্ধ্যায় সেখানে এসেছেন জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। দর্শনের তিনি একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। ঈশ্বরচন্দ্র তখন সাহিত্য-দর্শন আবৃত্তি করছিলেন। তর্ক-পঞ্চানন মশাই দেখে শুনে অবাক হলেন। জানতে চাইলেন ছেলেটি কে?

— এটি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, বললেন তর্কবাচস্পতি

— কোথায় বাড়ি? কার ছেলে?

— বীরসিংহের ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে, রামজয় তর্কভূষণের নাতি।

— কিন্তু এটুকু ছেলে দর্শনের কি বুঝবে?

— একবার যাচিয়ে দেখুন না।

তর্কপঞ্চানন মশায় তক্ষুণি ন্যায়শাস্ত্রের বিষয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। দেখলেন কিশোর ছাত্রটি সত্যই অসাধারণ পণ্ডিত। সকলের সামনেই তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, তারানাথ, তুমি দেখে নিও এই ছেলেটি কালে সমস্ত বাংলাদেশে অদ্বিতীয় লোক হবে।

পরে সত্যিই এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। সত্যিই ঈশ্বরচন্দ্র সকল দিক দিয়ে বাংলার এক অদ্বিতীয় পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন।

অলঙ্কার শ্রেণীর সময়েই কলেজের অধ্যক্ষের বিশেষ অনুমতি

নিয়ে ঈশ্বর স্মৃতিশাস্ত্র পড়তে শুরু করেন, এবং দুই বছরের মধ্যেই তিনি স্মৃতির মতন কঠিন বইগুলি পড়ে শেষ করেন। স্মৃতি বড়ো কঠিন শাস্ত্র। কিন্তু ঈশ্বরের একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের কাছে কঠিন বলে কিছুই ছিলনা। এখানেও তাঁর বুদ্ধিবলের পরিচয় দিয়ে সকলকে চমৎকৃত করলেন। স্মৃতির শেষ পরীক্ষায় তিনি পুরস্কার পেলেন আশি টাকা আর সংস্কৃত গদ্যরচনায় প্রথম হয়ে একশো টাকা পুরস্কার লাভ করলেন। এতগুলো টাকা পুরস্কার পেয়ে তিনি কি করলেন? ঠাকুরদাসের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, বাবা, আপনি এই টাকায় তীর্থ করে আসুন।

স্মৃতির পরীক্ষায় পাশ করে তিনি 'জজ পণ্ডিত' হবার জন্য আর একটা পরীক্ষা দিলেন। জজ পণ্ডিত-এর চাকরিটি ছিল এখনকার মতো হাকিমের পদ। খুব সম্মানের চাকরি। অনেকে বহুদিন পরিশ্রম করে তবে কেউ এই পরীক্ষায় উৎরাতে পারতো। ঈশ্বরের ছিল সবই অদ্ভুত। যেই পরীক্ষা দেওয়া অমনি পাশ করা। যেমন তেমন পাশ নয়, আর সব পরীক্ষার্থীর চেয়ে বেশি নম্বর রেখে পাশ। উনিশ বছর বয়সে তিনি 'জজ পণ্ডিত' হলেন। ঠাকুরদাসের কি আনন্দ! একটা চাকরির খবর পেয়ে গেলেন ত্রিপুরায়। কিন্তু সেখানে তিনি ছেলেমানুষ একলা যেতে হয়। সেইজন্য ঠাকুরদাস ছেলেকে একা দূরদেশে পাঠাতে রাজী হলেন না। পড়ার ক্ষতি হবে, সেই ঈশ্বরচন্দ্র সে চাকরি নিলেন না। আবার পড়তে গেলেন।

এর মধ্যে নিজের চেষ্টায় তিনি কিছু ইংরেজীও শিখেছিলেন। সংস্কৃতে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। বড় বড় সভাসমিতিতে বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করলেন, শাস্ত্রের বিচার করলেন। মুখে মুখে সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক তৈরি করতে পারতেন।

এরপর ঈশ্বর ন্যায় আর দর্শনের ক্লাসে ভর্তি হলেন। তিন বছরে ন্যায়ের পড়া শেষ হলো। পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পুরস্কার পেলেন একশো টাকা।

সংস্কৃত কলেজের পড়া শেষ হলো।

শেষ হলো ঈশ্বরচন্দ্রের গৌরবময় ছাত্রজীবন। আর কোনো বিষয়ই তাঁর পড়বার বাকী রইলনা। সকল পরীক্ষাতেই প্রথম হয়েছেন, বৃত্তি পেয়েছেন। অধ্যাপকেরা খুব খুশি। এরকম কৃতী ছাত্রকে তো আর এক ছাত্রদের মতো শুধু একখানা প্রশংসাপত্র দিলে চলবেনা। তাঁরা সবাই মিলে ঠিক করলেন — এমন (উপাধি) একটা ঐ ছাত্রটিকে দিতে হবে যা কোনো ছাত্রকে এখনো দেওয়া হয়নি। তখন সকলে মিলে একমত হয়ে তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করলেন।

বীরসিংহের ঈশ্বরচন্দ্র হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

রামজয়ের সেই এঁড়ে বাছুর হলেন এখন বিদ্যাসাগর।

দুর্গাদেবী, ভগবতী দেবী আর ঠাকুরদাসের আনন্দের সীমা রইলনা। তাঁর সকল কষ্ট যেন সার্থক হলো। তখন থেকে আসল নামটা চাপা পড়ল — দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল শুধু উপাধিটি — বিদ্যাসাগর।

এর মধ্যেই রইল তাঁর ছাত্রজীবনের উজ্জ্বল পরিচয়। আর রইল একটা যুগের ইতিহাস — যে যুগে বাংলার সাহিত্যে সোনার ফসল ফলেছিল। জন্মেছিলেন একের পর এক অনেক মনস্বী। তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট প্রবীণ ছিলেন বিদ্যাসাগর। প্রবীণ ছিলেন তিনি চরিত্রের আর হৃদয়ের শক্তিতে আর্দ্রতায়।

॥ ছয় ॥

গয়াতীর্থ সেরে কলকাতায় ফিরলেন ঠাকুরদাস।

এসে শুনলেন ঈশ্বরের কৃতিত্বের কথা — তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেছেন সংস্কৃত কলেজ থেকে। [illegible] বললেন তিনি। দশটাকা মাইনের চাকরি করে, কী কষ্টই না তিনি ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। আজ তাঁর সেইসব কষ্ট স্বীকার করা সার্থক হলো। তীর্থ করতে গিয়ে কিছু দেনা হয়েছিল ঠাকুরদাসের। কথায় কথায় ছেলের কাছে কথাটা তুললেন তিনি একদিন।

— সেজন্য আপনি চিন্তিত হবেন না। [illegible] দর্শনের [illegible] পরীক্ষা দিয়ে আমি যেটা [illegible] তেত্রিশ টাকা পেয়েছি। সেই টাকা তো সবই রয়েছে; আমি তার কিছুই খরচ করিনি। সেই দিয়ে আপনার তীর্থের দেনা শোধ হবে।

উপযুক্ত ছেলের উপযুক্ত কথা। স্নেহভরে ঠাকুরদাসের বুক ভরে উঠল। মনে মনে তিনি ছেলেকে আশীর্বাদ করলেন।

সংস্কৃত কলেজে যে বারো বছর তিনি পড়েছিলেন সেই সময়ের মধ্যে বিদ্যাসাগর কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। সবকটা [illegible] বিষয়ে তিনি পারদর্শী হয়েছিলেন — ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, বেদান্ত, ন্যায়, জ্যোতিষ আর দর্শন। এই জন্য তাঁর শিক্ষকরা তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' এই দুর্লভ উপাধিতে ভূষিত করলেন। তারপর শেষ হলো তাঁর ছাত্রজীবন। এবার তিনি প্রবেশ করলেন কর্মক্ষেত্রে।

ঠাকুরদাসের ইচ্ছা ছিল দেশে গিয়ে ঈশ্বর একটি টোল খুলে বসবেন। কিন্তু পরে তাঁর সেই মত বদলায়। [illegible] দেশে মায়ের নামে বিদ্যাসাগর একটি স্কুল করেছিলেন, সে কথা পরে বলব। কলকাতায় [illegible] ফোর্ট উইলিয়াম

কলেজ বলে একটা কলেজ ছিল। বিদ্যাসাগরের জন্মের কুড়ি বছর আগে এই কলেজটা স্থাপিত হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যেসব সাহেব সিভিলিয়ান এদেশে চাকরি নিয়ে আসতো তাদেরই পড়াবার জন্যে এই কলেজটা হয়েছিল। এইখানে তাঁদের বাংলা, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী ইত্যাদি ভাষা শিখতে হতো। মার্শাল সাহেব তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ। সংস্কৃত কলেজের সেরা ছাত্র হিসেবে বিদ্যাসাগরের নাম তিনি শুনেছেন।

মার্শাল সাহেব নিজে থেকেই একদিন বিদ্যাসাগরকে ডেকে পাঠালেন। হেড পণ্ডিতের একটা চাকরি খালি আছে। মার্শালের ইচ্ছে বিদ্যাসাগরকে সেই চাকরী দেন। শুনে নিজে থেকেই প্রস্তাব করলেন তিনি। বিদ্যাসাগর রাজী হলেন। সেই থেকে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা পড়াবার জন্য হেড পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হলেন তিনি। মাইনে মাসে পঞ্চাশ টাকা।

চাকরি হলো। জীবনের প্রথম হিসেবে সেই বড়ো চাকরি। বিদ্যাসাগর তখন ঠাকুরদাসকে বললেন, বাবা, আমার তো এখন একটা বড়ো চাকরি হয়েছে। আপনি এইবার কাজের নিয়ম ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম করুন। আর সংসারের ভার আমাকে ছেড়ে দিন। এই কথা শুনে ঠাকুরদাস সত্যিকারেই খুশি হলেন। ছেলেকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন তিনি।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরি করবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর ইংরেজী শিখতে লাগলেন। এর সঙ্গে হিন্দীও। আশ্চর্য মেধাবী ছিলেন তিনি। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এই দুটি ভাষা সুন্দরভাবে আয়ত্ত করে ফেললেন। জীবনের দুর্দিনে

বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শহরের প্রথম নাম-করা ডাক্তার। ইনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রিয় বন্ধু। বেশ ইংরেজী জানতেন তিনি। ঈশ্বরচন্দ্র প্রথমে এঁর কাছেই ইংরেজী শিখেছিলেন।

মার্শাল সাহেব খুব সন্তুষ্ট হলেন বিদ্যাসাগরের জ্ঞানবুদ্ধি আর ব্যবহার দেখবার সুযোগে। ইংরেজ রাজপুরুষ মহলে তাঁর খাতির দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। অথচ হাতে তাঁর কোনো [illegible] ছিলনা; কোনো পৃষ্ঠপোষকও ছিলনা। যেমন স্বাধীনচেতা ছিলেন, তেমনি স্বাধীনচেতাই রইলেন তিনি। চাকরির জন্য নিজের সম্মান তিনি একটুকু বিসর্জন দেন নি কখনো। এমন কি বিদ্যাসাগরের ওপর, যখন সাহেবদের পরীক্ষার ভার পড়লো তখনো সেখানে তাঁর নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতা দেখে সবাই বিস্মিত হলো।

বিদ্যাসাগরের বন্ধু-প্রীতি কি রকম প্রখর ছিল, তা শুনলে আশ্চর্য হতে হয়। যাঁর কাছে তিনি প্রথম ইংরেজী শিখেছিলেন, সেই দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখনো ডাক্তার হন নি। তখন তিনি হেয়ার স্কুলের মাস্টার। তাছাড়া ডাক্তারী পড়তে প্রচুর টাকা দরকার। ঠিক এই সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে হেড রাইটারের একটা চাকরি খালি হল। মাইনে আশী টাকা। বিদ্যাসাগর মার্শাল সাহেবকে অনুরোধ করলেন এই কাজটা দুর্গাচরণকে দেবার জন্য।

— কী রকম ইংরেজী জানেন আপনার বন্ধু?

— খুব ভালো। এমন ইংরেজী সাহেবেরাও বলতে পারেন না।

— তাই নাকি! তাহলে ওঁকেই আমি এই পদে নিযুক্ত করলাম।

বন্ধুর জন্য এই উপকারটুকু করতে পেরে বিদ্যাসাগরের সে কী আনন্দ!

এই চাকরিটি হয়েছিল বলেই না দুর্গাচরণবাবু মেডিকেল কলেজে পড়তে সক্ষম হয়েছিলেন। এই দুর্গাচরণ ডাক্তারের প্রখ্যাত পুত্র ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। যিনি ছিলেন নবীন ভারতের ও স্বদেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

বিদ্যাসাগরের বন্ধু-প্রীতির আরো একটি গল্প আছে।

সংস্কৃত কলেজে নব্বই টাকা মাইনের একটি চাকরি খালি হলো। কলেজের কর্তৃপক্ষের ভারি ইচ্ছা ছিল বিদ্যাসাগর এই পদটা গ্রহণ করেন। তবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে হেড পণ্ডিতের চাকরি করে তিনি মাইনে পেতেন মাসে মাত্র পঞ্চাশ টাকা। আর সংস্কৃত কলেজের এই চাকরিটি নিলে মাইনে হয় নব্বই টাকা।

– কি পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের চাকরিটি নেবেন নাকি?

– না। এইখানেই তো চাকরি করছি।

তবে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের কর্তাদের অনুরোধ করলেন যাতে এই চাকরিটা আর একজন যোগ্য পণ্ডিতকে দেওয়া হয়। তিনি তাঁরই এক বন্ধু। নাম– তারানাথ তর্কবাচস্পতি। সেইমতো করলেন। বলে দিয়েছিলেন যে, যদি কখনো সুযোগ আসে তাহলে তিনি বন্ধুর উপকার করবেন। সেই সুযোগ যখন এলো, তখন তিনি তাঁর বন্ধুর জন্য স্বার্থ ত্যাগ করলেন, নিজের কথা চিন্তা করলেন না।

সময়মতো আবার গিয়ে মার্শাল সাহেবের কাছে সুপারিশ তুললেন। বললেন, ইনি খুব যোগ্য লোক। ওঁকেই ঐ চাকরী দিন। আমার তো একটা চাকরি আছে। ওঁর নেই, ওঁর প্রকৃতই দরকার।

বিদ্যাসাগরকে দেখে শিক্ষাবিভাগের সর্বময় কর্তা সাহেব খুশি হলেন।

কিন্তু তাঁর সুপারিশ তিনি প্রত্যাহার করতে পারলেন না। শেষ পর্যায়ে বাচস্পতিকেই ঐ নব্বই টাকা মাইনের চাকরিটা দেওয়া হলো। কিন্তু নতুন সমস্যা দেখা দিলো। বাচস্পতি থাকেন কালনায় — কলকাতা থেকে হাঁটাপথে মাইল পঞ্চাশ দূরে। তাঁকে কে খবর দেবে?

পরদিন ছিল শনিবার। সোমবার থেকেই কাজ করতে হবে। চিঠি পাঠালে সময় হবে না। বন্ধুর জন্য বিদ্যাসাগর এত করলেন আর এটুকু করতে পারবেন না? ঐ রাতেই তিনি পায়ে হেঁটে কালনায় রওনা হলেন। সারা রাত পথ চলে পরের দিন দুপুর বেলায় ধূলি ধূসরিত পায়ে বিদ্যাসাগর এসে উপস্থিত হলেন তাঁর বন্ধুর বাড়িতে। পৌঁছে প্রথমেই তাঁকে সুখবরটি দিলেন। শুনে বাচস্পতির মুখে কোনো কথা নেই। চোখের নীরব অশ্রুধারায় জানালেন তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা। মুখে শুধু বললেন, 'ঈশ্বর, তুমি মানুষ নও, তুমি দেবতা।'

সেই থেকে সংস্কৃত কলেজে যখনই নতুন অধ্যাপক নেওয়ার দরকার হতো, অমনি ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগরের সঙ্গেই পরামর্শ করে কাজ করতেন।

Space

বড়বাজার থেকে বিদ্যাসাগর এবার উঠে এলেন বৌবাজারে। নিজেই একটা আলাদা বাসা করেছেন। ন-দশজন লোক বাসায়। ঠাকুরদাস থাকেন দেশে। বাবাকে মাসে মাসে তিনকুড়ি টাকা করে পাঠাতেন। বাকী টাকায় তিনি কলকাতার সংসার খরচ চালাতেন। তাঁর এই সহোদর, দুটি খুড়তুতো ভাই, দুটি পিসতুতো ভাই, একটি মামাতো ভাই আর পুরনো চাকর শ্রীরাম — এই ক'জনকে নিয়ে কলকাতার বাসায় থাকতেন বিদ্যাসাগর। এছাড়া নিজের সংস্কৃত চর্চা আর,

ইংরেজী পড়া আছে, আবার শাসনকে সংস্কৃত পড়াতে হয়, তার ওপর কলেজের চাকরি। এতসব করেও তিনি কিন্তু রান্নার কাজটি ঠিকমতো দেখতেন। একটি মুহূর্তও তিনি বৃথা কাটালেন না। কেবল কাজ আর কাজ।

চাকরি করেন বলে নিশ্চিন্ত আরাম উপভোগ করলেন না। নাম, যশ বা দাবা নিদ্রা গেলেমশাই — আসরের দিক দিয়ে গেলেন না। কাউকে খেলতে, না গল্প করতে দেখলে রীতিমত বিরক্ত হতেন। দিনরাত কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতেন বিদ্যাসাগর। পরিশ্রম ছিল তাঁর জীবনের সাথী। পঞ্চাশ টাকা মাইনে পেয়েছেন যখন তখনো যেমন পরিশ্রম করেছেন, পরে যখন পাঁচশো টাকা উপায় করেছেন তখনো সেই একইভাবে খেটেছেন আর কষ্ট স্বীকার করেছেন।

বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সাহেব সিভিলিয়ানদের বাংলা পড়ালেন এবং বাংলার পরীক্ষা নিতেও নিতেন। হেড পণ্ডিত যে পুরোদস্তুর হেড পণ্ডিত। তাঁর ওপর কাজের চেয়ে সহজ বলার উপায় ছিল না। এই তাঁর প্রথম চাকরি, তবু চাকরির মায়া করলেন না একটুকু। যে সব ইংরেজ কর্মচারী বিলেত থেকে এদেশে আসতেন, তাঁদের সবাইকে দেশীয় ভাষায় পরীক্ষা দিতে হতো। পাশ করতে পারলে তবে তাঁরা সিভিলিয়ান হবেন। পাশ করতে না পারলে আবার দেশে ফিরে যেতে হবে। বিদ্যাসাগরের ভার ছিল তাঁদের বাংলা ও হিন্দী পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। তিনি ঠিকমতো পরীক্ষা নিতেন, কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব দেখাতেন না। প্রায় অধিকাংশের ভোটেরে ফলাফল, এই কারণেই [illegible]।

মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, পণ্ডিত, আপনি বড় কঠিন করে সাহেবদের পরীক্ষা নেন। আর প্রশ্ন যদি সহজ করেন প্রশ্নগুলো,

তাহলে ভালো হয়। যারা ফেল করে ওদের যে আবার দেশে ফিরে যেতে হয়। অনেক কষ্ট করে ধার কর্জ করে ওরা আসে, এখানে চাকরিও পায় না।

— এটা আমাকে দিয়ে হবে না। যে পাশ করার যোগ্য নয়, তাকে পাশ করিয়ে দেব কেমন করে?

— না, না — সে কথা বলছি না। আমি বলছি যে ওদের কথা ভেবে পরীক্ষার সময় যদি বিশেষভাবে একটু বিবেচনা করেন, তাহলে বেচারীদের উপকার হয়।

— আমি তা পারব না।

— কেন পারবেন না। অন্য শিক্ষকেরা তো করে থাকেন।

— যার যোগ্যতা নেই তাকে পাশ করানো মানে অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া। আমাকে দিয়ে এসব চলবে না। আপনারা অন্য লোক দেখুন।

জার্মান সাহেব বিদ্যাসাগরের মুখে এইরকম নির্ভীক উক্তি শুনে অবাক হলেন। তাঁর ওপরে আরো শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। বললেন, সাধু, আপনি যা ভালো বুঝবেন করবেন। আমি এ-বিষয়ে আর কিছু বলব না।

এমনি স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর।

এর পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তাঁর সারাজীবনের পদে পদে।

তাঁর এই কর্তব্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতাই তাঁকে ইংরেজ রাজপুরুষদের কাছে পরম শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল। তাঁর স্বদেশবাসীর কাছেও।

৫।১২।৮৩

হঠাৎ একদিন বাড়ি থেকে চিঠি পেলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর ছোট ভাইয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। ভগবতী দেবী লিখেছেন, 'ঈশ্বর, তুমি অতি অবশ্য বাড়ি আসিবে।' ভাইয়ের বিয়ে, তার ওপর মা ডেকে পাঠিয়েছেন, বিদ্যাসাগর আর স্থির থাকতে পারেন?

মার্শাল সাহেবের কাছে ছুটি চাইলেন বিদ্যাসাগর।

কিন্তু সেসময় কলেজে এত বেশি কাজ যে, মার্শাল কিছুতেই তাঁকে ছুটি দিতে রাজী হলেন না। বললেন, এখনি তিনি ছুটি দিতে পারেন না। এদিকে বাসার সবাই দেশে চলে গেছে। তাদের অবশ্য তিনি মাকে বলে পাঠিয়েছেন যে তিনি পরে আসছেন। অথচ সাহেব ছুটি দিতে নারাজ। মন খারাপ হয়ে গেল। ভাইয়ের বিয়ে, মা তাঁকে যেতে লিখেছেন। ছুটি না পেলে মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হবেনা। সারা দিনের মধ্যে এইসব কথা চিন্তা করেন আর ক্রমেই বিদ্যাসাগরের মন ভারী হয়ে ওঠে। সারা রাত ঘুম হলনা।

পরের দিন কলেজে এসেই তিনি মার্শালকে বললেন, আমার মা আমাকে বাড়ি যেতে বলেছেন, আমায় যেতেই হবে। হয় ছুটি দিন, না হয় আমি চাকরি ছেড়ে দেব।

পণ্ডিতের আকুলতা দেখে মার্শাল সাহেব যারপর নাই আশ্চর্য হলেন। তখনি তিনি চারদিনের জন্য ছুটি মঞ্জুর করে দিলেন। ছুটি পেয়ে বিদ্যাসাগরের বুক থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল। তখনি তিনি দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এদিকে ভগবতী দেবী ছেলের আসার জন্য দিন গুনছেন।

তখন বর্ষাকাল। ঘোর দুর্যোগ। কলকাতা থেকে বীরসিংহে

রওনা হয়ে তিনি যখন পৌঁছলেন দামোদরের তীরে। বর্ষায় দামোদরের তখন ভয়ংকর চেহারা। জল থৈ থৈ করছে। নদীতে একখানা নৌকোও নেই। কিন্তু আজকে তাঁকে বীরসিংহে পৌঁছুতেই হবে। অথচ আজই রাতের ভিতর নয়। মা যে পথ চেয়ে অপেক্ষা করছেন! কি করবে, মহা ভাবনায় পড়লেন তিনি। তখন মায়ের নাম স্মরণ করে ভরা দামোদরের বুকে ঝাঁপ দিলেন তিনি। বর্ষার ভরা দামোদর পার হলেন।

এপারে এসে অনেকটা পথ হাঁটতে হলো। পথে আর একটা খরস্রোত নদী — দারকেশ্বর। বর্ষায় জলে সেটিও পরিপূর্ণ। তাও তেমনি সাঁতরে পার হলেন। গ্রামে যখন এলেন সন্ধ্যা। চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো। পথে চোর ডাকাতের ভয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর নির্ভীক। মনে মনে মাকে ডাকতে লাগলেন। আর পথ চলতে [redacted] লাগলেন। রাত দশটা বেজে গিয়েছে। তিন প্রহর, ক্লান্ত শরীরে তিনি বাড়ি পৌঁছলেন। বাড়িতে ঢুকেই তিনি ডাকলেন, মা, আমি এসেছি।

এই মাতৃভক্তির কোথাও তুলনা আছে?

॥ সাত ॥

পাঁচ বছর কেটে গেল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে।

কাজ করলেন বিদ্যাসাগর খুব সুখ্যাতির সঙ্গেই।

এই সময় সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের চাকরীটা খালি হলো। রসময় দত্ত ছিলেন কলেজের সম্পাদক বা সেক্রেটারি। তিনি কলেজে খুব বেশী সময় দিতে পারেন না। সেইজন্য একজন সহকারী দরকার। শিক্ষা বিভাগের কর্তা, ময়েট সাহেব ঐ নতুন পদের জন্য একজন যোগ্য লোক বাছার জন্য মার্শাল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। ইংরেজী ও সংস্কৃত দুটোই ভালো জানে, যিনি কলেজের উন্নতি সাধনে সক্ষম — এমন একজন লোক তাঁর দরকার।

— একজন লোককে তো দেখছি একেবারেই অদ্ভুত। বলেন মার্শাল।

— কে তিনি?

— পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

— তিনি কি আপনার কলেজের চাকরীটুকু ছাড়তে রাজী হবেন?

— আমি জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারি একবার।

তারপর মার্শাল সাহেব একদিন বিদ্যাসাগরকে ডেকে সব কথা বললেন তাঁকে। সব শুনে তিনি বললেন, ওখানে সহকারী সম্পাদকের কাজ নিতে পারি যদি স্বাধীনভাবে করতে পাই। নইলে দরকার নেই।

— তাতে কোন রকম অসুবিধা হবে না আপনার।

— আর একটা কথা। কথা নয় অনুরোধ। আমি চাকরীতে যোগদানের পর থেকে আমার বাবাকে আর কাজ করতে দিইনি। সংসারের সম্পূর্ণ দায়িত্বটা

॥ সাত ॥

পাঁচ বছর কেটে গেল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে।

কাজ করলেন বিদ্যাসাগর খুব সুখ্যাতির সঙ্গেই।

এই সময় সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের চেয়ারটা খালি হলো। রসময় দত্ত তখন কলেজের সম্পাদক বা সেক্রেটারি। তিনি কলেজে খুব বেশি সময় দিতে পারেন না। সেইজন্য একজন সহকারী দরকার। শিক্ষা বিভাগের কর্তা, ময়েট সাহেব এ নতুন পদের জন্য একজন যোগ্য লোক খোঁজার জন্য মার্শাল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। ইংরেজী ও সংস্কৃত দুটো ভাষাই ভালো করে জানে, যিনি কলেজের উন্নতি সাধনে সক্ষম — এমন একজন লোক তাঁর দরকার।

— এমন লোক তো দেখছি একজনই আছেন। বলেন মার্শাল।

— কে তিনি?

— পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

— তিনি কি আপনার কলেজের চাকরী ছেড়ে আসতে রাজী হবেন?

— আমি জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারি একবার।

তারপর মার্শাল সাহেব একদিন বিদ্যাসাগরকে ডেকে সব কথা বললেন তাঁকে। সব শুনে তিনি বললেন, ওখানে সহকারী সম্পাদকের কাজ নিতে পারি যদি স্বাধীনভাবে করতে পাই। নইলে দরকার নেই।

— তাতে বোধ হয় কোনো অসুবিধে হবে না আপনার।

— আর একটা কথা। একটা নয় অনুরোধ। আমি চাকরীতে ঢোকার পর থেকে আমার বাবাকে আর কাজ করতে দিইনা। সংসারের সম্পূর্ণ দায়িত্বটা

এখন তোমার খবর। যদি কোনো কারণে সংস্কৃত কলেজের চাকরী আমাকে ছাড়তে হয়, তবে খুবই বিপদে পড়ব। তাই বলছি যে, রামকমল সেই পণ্ডিতের কাছে যদি আমার হয়ে কইয়ে দেন। সেও বেশ যোগ্য লোক।

বিদ্যাসাগরের সরলতা মার্শালকে মুগ্ধ করলো। তিনি যা বললেন মার্শাল তাই করলেন। তাঁর সেই দীনবন্ধুকে তিনি হেড পণ্ডিতের চাকরী দিলেন আর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হলো। মাইনে অবশ্য সেই পঞ্চাশটাকা। তবে এই পদের সম্মান ও দায়িত্ব অনেক বেশি।

সংস্কৃত কলেজের প্রথম বিদ্যাসাগর সহকারী সম্পাদক হয়ে। বহু উন্নতি করে তোলে এর অনেকখানি ভেলে দিলেন। এখনো পর্যন্ত এটা নামেই মাত্র কলেজ ছিল। আসলে পাঠ বাড়িতে একটা টোল ছাড়া আর কিছু ছিল না। পণ্ডিতেরা আসতেন যার যখন খুশি, আবার চলেও যেতেন নিজেদের ইচ্ছামত। ছাত্রদের বাঁধাধরা কোনো নিয়ম কানুন ছিল না। তার উপর অনেকে বিনা-মূল্যেও দিতো। গরিবকাল হতে কেবল ছাত্ররা তামাক দিয়ে তাঁদের খাতির করতো। এই ছিল কলেজের চেহারা।

বিদ্যাসাগর এসেই এই পুরো নিয়মের ব্যবস্থা পরিবর্তন করে দিলেন। পণ্ডিতদের ডেকে বললেন, এখন থেকে আপনারা ঠিক নিয়মমতে কলেজে আসবেন। ঠিক দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই আসতে হবে আর বিকেল পাঁচটার আগে কেউ যেতে পারবেন না। বলা বাহুল্য, অনেকেই এই নতুন ব্যবস্থা খুব ভালো মনে নিতে পারেন নি। অনেকেই আড়ালে অভিযোগ করেন, এসব কেন বাড়াবাড়ি।

ছাত্রদের বেলাও সেই ব্যবস্থা হলো — সময়মত কলেজে আসা-

পরীক্ষার মধ্যে ঠিক করে দিয়েছ। আর তারা যে নিজেদের খুশিমত ক্লাস থেকে প্রশ্ন-উত্তর বিনা পাশে বাইরে চলে যেত, তাও তিনি বন্ধ করলেন। আবার নম্বর লেখা পাস নিয়ে বাইরে যাবার নিয়ম হলো। সেই পাস দেখাতে না পারলে দারোয়ান কোনো ছাত্রকে ছাড়তো না। এমনি করে তার কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার দরুন দেখা গেল এই শিক্ষায়তনে। যেন থেকে যখনকার মত শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মানুবর্তিতা চলতে লাগলো।

পরীক্ষার ব্যাপারেও বিদ্যাসাগর কিছু নতুন নিয়ম করলেন। তার ফলে আগের বছরের চেয়ে সে-বছরের পরীক্ষার ফল ভালোই হলো। শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারি ময়েট সাহেব খুব খুশি হলেন তাঁর কার্যকুশলতা দেখে। আগে ছাত্ররা শেষ একেবারেই ছাত্রদের চার-পাঁচ বছর লাগতো। বৃথা সময় নষ্ট হতো। তিনি খুব সহজভাবে নতুনভাবে শেখাবার পদ্ধতি চালু করলেন।

আগে সংস্কৃত কলেজে ছেলেদের অঙ্ক শেখাবার কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। বিদ্যাসাগর সাহিত্যের ক্লাসে অঙ্ক শেখাবার [redacted] ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে নানা দিকে দিন দিন কলেজের উন্নতি হতে লাগলো। সকলের মুখেই বিদ্যাসাগরের সুখ্যাতির কথা। তিনি সহকারী সম্পাদক হওয়ার পর থেকে সংস্কৃত কলেজের চেহারা যেন একেবারে বদলে গেলো। কর্তৃপক্ষ তাঁর কাজের প্রশংসা করলেন। এইসময়ে একটা ঘটনার ফলে দেশের লোক বিদ্যাসাগরের আত্মসম্মানবোধ ও তেজস্বিতার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলো। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সঙ্গে যে ব্যাপারটা ঘটেছিল সেটা আজকেই

তোমাকে পারছে। সেই ঘটনার পর থেকে সবাই বুঝলো যে, বিদ্যাসাগরের শির উন্নত শির যেখানে, কখনো কারো কাছে নত হবার নয়।

কয়েক মাস পরের কথা। কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদটি খালি হলো। মার্শেল সাহেব ও সম্পাদক রসময় বাবুর ইচ্ছা বিদ্যাসাগরকেই এই পদটিতে নিযুক্ত করা হয়। মাইনেও বেশি। কিন্তু তাঁর কাছে টাকাটাই বড়ো ছিল না। কলেজের উন্নতি কিসে হয়, এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। অধ্যাপকের কাজ নিলে কলেজের প্রশাসনিক ব্যাপারে কিছু করার সুযোগ পাবেন না জেনেই তিনি ঐ চাকরী নিতে রাজী হলেন না।

—তবে এই পদে কাকে নিয়োগ করা যায়? — জিজ্ঞাসা করেন মার্শেল সাহেব।

— পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিয়োগ করুন। এই পদের জন্য তিনিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি।

— তিনি তো কৃষ্ণনগর কলেজে কাজ করছেন। তার চেয়ে বরং যিনি ঐ পদে কাজ চালাচ্ছেন সেই বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে এই কাজে স্থায়ীভাবে বহাল করলে কেমন হয়?

— আমার তাতে মত নেই। তিনি বুড়ো হয়েছেন, বেশিরভাগ সময় তাঁকে ঘুমাতে দেখি। তাঁর অধ্যাপনায় ছাত্রদের কোনো উন্নতি হবে না। সেইজন্য আমার মদনমোহনই যোগ্য লোক।

শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের কথাই থাকলো। পণ্ডিত মদনমোহনকেই ঐ পদে নিযুক্ত করা হলো। ইনি ছিলেন তাঁরই সহপাঠী এবং বন্ধু। সেই বন্ধুর কাছে

চাকরির খবরটা পেয়ে বিদ্যাসাগর মনে মনে খুব তৃপ্তি বোধ করলেন। [illegible] এ বেশি মাইনের চাকরীটা তো তিনি নিজেই নিতে পারতেন। কিন্তু বন্ধুর জন্যে এই যে স্বার্থত্যাগ, এ একমাত্র বিদ্যাসাগরের পক্ষেই সম্ভব। এইরকম উন্নত-চরিত্রের মানুষ ছিলেন তিনি।

দিন যায়।

বিদ্যাসাগর নিয়মিতভাবে সহকারী সম্পাদকের কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু বেশি দিন এ কাজ করা তাঁর পোষালো না। এমনিতে তো তিনি ছিলেন তেজস্বী প্রকৃতির লোক। তার উপর কারো খোশামদ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। উচিত কথা বলতে কখনো তিনি ভয় পেতেন না। কখনো কারো কাছে মাথা নত করেন না। তাছাড়া কোনো রকম অন্যায় তিনি সহ্য করতে পারতেন না একেবারেই।

এইজন্য ক্রমে কলেজের কাজকর্ম নিয়ে রসময় বাবুর সঙ্গে তাঁর মতের অমিল হতে লাগল। তিনি একরকম করতে চান, কিন্তু সম্পাদক হিসেবে রসময় দত্ত ঠিক তার উল্টো কথা বলেন। এইভাবে ঝগড়াঝাঁটি করে কাজ করা চলেনা। শেষে একদিন বিরক্ত হয়েই বিদ্যাসাগর চাকরী ছেড়ে দিলেন। অনেকে বারণ করলেন, তবু কিছুতেই কারো কথা শুনলেন না তিনি। এমন কি ময়েট সাহেব পর্যন্ত তাঁকে বোঝালেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জেদটি ছিল সাংঘাতিক — ঠিক এঁড়ে বাছুরের জেদ। শেষ পর্যন্ত তিনি কাজ ছেড়েই দিলেন।

বন্ধুরা শুনে বিস্মিত হলেন।

কেউবা দুঃখিত হলেন। একজন তাঁকে বললেন, চাকরী তো ছেড়ে দিলে

রাগ করে। খুব মজুরি দেখালে, তখন যাবে কি?

— বেশ, আলু পটল বেচে খাবো। মুদির দোকান করবো, তবু যে-কাজে নিজের ইজ্জৎ হানি হয়, তেমন চাকরী নয় না করলাম। — বন্ধুর মুখের ওপর জবাব দিলেন বিদ্যাসাগর। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পক্ষে এমন অসাধারণ মনের বল কেউ কখনো কল্পনা করতে পারে? এমনি অজেয় মনোবলের অধিকারী ছিলেন তিনি। এর পরিচয় আছে তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি কাজে, প্রত্যেকটি অধ্যায়। এ জিনিস তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন তাঁর ঠাকুরদা রামজয় তর্কভূষণের কাছ থেকেই। তাই না সেদিন বিদ্যাসাগর হতে পেরেছিলেন সারা দেশের সেরা মানুষ — চরিত্রে, কর্মে ও চিন্তায়।

Space

চাকরী ছেড়ে দেবার কিছু দিন পরে মার্শাল সাহেবের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলেন বিদ্যাসাগর। সাহেব একবার দেখা করতে লিখেছেন। ঠিক সেই সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে হেড রাইটারের কাজটা সবে খালি হয়েছে। ও পদে যিনি কাজ করছিলেন, সেই দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তারী পাশ করে স্বাধীন ব্যবসা শুরু করেছেন। বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ গিয়ে দেখা করলেন। মার্শাল সাহেবের অনুরোধে তিনি কাজটা নিলেন। মাইনে আশি টাকা। সংস্কৃত কলেজের কাজটা ছেড়ে দেবার পর তাঁর একটা দুশ্চিন্তা ছিল মনে। সেটা অবশ্য তাঁর নিজের জন্য নয়। তখন অনেকগুলি লোকের খাওয়া-পরার ভার ছিল তাঁর ওপর। প্রায় জন কুড়ি গরীব ছাত্র তাঁর বাসায় থেকে পড়াশুনা করে। এই অবস্থাতেও তিনি চাকরি ছেড়ে দিতে দ্বিধা করেননি। ঋণ নিয়ে ধার করে তাদের খরচ চালাতেন। এবার তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

হেড রাইটারের চাকরী তাঁকে অবশ্য বেশিদিন করতে হলো না। এই সময় থেকেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর নাম। যে সংস্কৃত কলেজের চাকরী তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেইখান থেকেই একদিন আবার ডাক এলো। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের খুব অসুখ, কলকাতার জল-হাওয়া তাঁর সহ্য হচ্ছে না। তিনি এই মুর্শিদাবাদে জজ পণ্ডিতের চাকরী নিয়ে চলে গেলেন। সাহিত্যের অধ্যাপকের পদটা এই অবসরে খালি হলো। ঐ পদে একজন ভালো লোক দরকার। ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগরকে বেশি মাইনেতে ঐ পদে নিযুক্ত করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর প্রথমে রাজী হননি। তিনি লিখে পাঠালেন: "কলেজের শিক্ষাব্যবস্থায় যদি আমাকে অধ্যক্ষের মতো ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলেই কেবল এই চাকরী নিতে প্রস্তুত আছি।"

ময়েট সাহেব তাতেই রাজী হলেন।

বিদ্যাসাগর আবার হলেন সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হলো.
১ তখন বিদ্যাসাগর সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন।

কিছুদিন পরে রসময় দত্ত চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। শিক্ষাবিষয়ের কর্তৃপক্ষ ভেবে কি করলে ভবিষ্যতে কলেজের উন্নতি হতে পারে, সেই বিষয়ে একটা রিপোর্ট তৈরি করবার জন্য, ১ নতুন সম্পাদক বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করলেন। অনেক খুব পরিশ্রম করে তিনি তৈরি করলেন সেই রিপোর্ট। সেটি পাঠ করে শিক্ষা সমিতির সভ্যরা খুব সন্তুষ্ট হলেন। তারপর তাঁরা বিদ্যাসাগরকেই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করলেন।

তাঁর এই রিপোর্টের ফলেই এই সংস্কৃত পাঠশালাটি সত্যিকার কলেজ

হয়ে যায়। এই রিপোর্টে তিনি বলেছিলেন: ছাত্রদের পাঠ্যক্রমের দুই অংশ সংস্কৃত ও প্রয়োজন ইংরেজী হবে। ছাত্রদের বাংলাও শিখতে হবে। এই রিপোর্টের ফলেই তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হলেন। ঘটনা হলো ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে। তখন বিদ্যাসাগরের বয়স মাত্র একত্রিশ বছর। তাঁর কর্মজীবনের এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা এখান থেকেই। সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হবার গৌরব তিনিই লাভ করেছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হলেন বিদ্যাসাগর। মাইনে হলো পাঁচশো টাকা। তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি ও উদ্যম নিয়ে এই বিদ্যায়তনটিকে একেবারে নতুন করে গড়ে তুলতে লেগেছিলেন। কলেজের সর্বময় কর্তা হয়ে তিনি এমন সব নিয়ম-কানুন করলেন যা আগে কখনো ছিলনা। আগে শুধু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের ছেলেরা এখানে পড়তে পারতো। তিনি নিয়ম করলেন যে, এখন থেকে সকল জাতের ছেলেরাই সংস্কৃত কলেজে পড়তে পারবে। অনেকে এই নিয়মটি পছন্দ করলো না; যেঁটে-ঘেঁটে এর জন্য তাঁর নিন্দে করতে লাগলো। সবাই বললে যে, বিদ্যাসাগর ইংরেজী-পড়া পণ্ডিত কিনা, তাই তাঁর জাত-বিচার নেই। তিনি এসবে কান দিলেন না। ছাত্ররা আগে এখানে বিনা মাইনেতে পড়তো। বিদ্যাসাগর মাইনের নতুন ব্যবস্থা করলেন। রবিবারের দিনে ছাত্রদের ছুটির ব্যবস্থা করলেন। এখন যে তোমরা স্কুল-কলেজে রবিবারের ছুটি — 'সাধার ভেকেশন' — ভোগ করে থাকো, এ নিয়মটি বিদ্যাসাগরই প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন।

আগেই বলা হয়েছে, সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদের ব্যাকরণের ক্লাসেই বার-পাঁচ বছর কেটে যেতো। বিদ্যাসাগর কঠিন পাণিনি আর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ

ঢেলে নতুন করে সাজালেন— লিখলেন উপক্রমণিকা। এর ফলে ছেলেদের সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম হলো। এই 'উপক্রমণিকা' বিদ্যাসাগরের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান। এদেশের ও বিদেশের উঁচুদরের পণ্ডিতেরা তাঁর প্রশংসা না করে পারেন নি।

সাহিত্যের ক্লাসেও সেই একই সমস্যা ছিল। এই ক্লাসে ছাত্রদের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি কঠিন কঠিন বই পড়তে হতো। সব পড়তে গিয়ে তাদের বুঝতে সময় নষ্ট হতো। অথচ অল্প বয়সের ছাত্ররা সব বই কিছুই বুঝতে পারতো না। এই অভাব দূর করার জন্য তাঁকে সহজ সহজ সংস্কৃত বই লিখতে হলো। পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, হিতোপদেশ আর মহাভারত থেকে বেছে বেছে তৈরি করলেন একটি সুন্দর সহজ সংকলন গ্রন্থ। তাঁর এই সংকলনটির নাম 'ঋজুপাঠ'। এই থেকে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের 'ঋজুপাঠ' প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ পড়ানো হতে লাগলো। এর ফলে ছেলেদের পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষা অনেক আগের চেয়ে অনেক সহজ হলো।

এইভাবে কলেজের উন্নতি সাধন করার পুরস্কার পেলেন তিনি। কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগরের মাইনে দেড়শো থেকে তিনশো টাকা করে দিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে পাঁচ বছর অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় থেকেই এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের শুরু হয়। তখন জেলায় জেলায় একটি স্কুল ছিলনা। শিক্ষাসমিতির সভাপতি ছিলেন তিনি একজন মহাপ্রাণ ইংরেজ। তাঁর নাম ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। কলকাতার বেথুন স্কুল ও বেথুন কলেজ আজও তাঁর স্মৃতি বহন করছে। এদেশে আসার অল্পদিন পরেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। সেই আলাপ পরিণত হয় বন্ধুত্বে।

ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে রামমোহনের পরম বন্ধু ছিলেন যেমন ডেভিড হেয়ার সাহেব, ঠিক সেই একই ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের পরম বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন বেথুন সাহেব। হেয়ার সাহেব এই দেশের মাটিতে মারা যান, বেথুন সাহেবও এই দেশে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত হলেন বেথুন। তিনি বুঝলেন যে, এদেশে শিক্ষা বিস্তারের কাজে এই পণ্ডিতের মতো উপযুক্ত লোক আর দ্বিতীয় নেই। তখন জেলায় জেলায় [redacted] মডেল স্কুল খোলা হয়েছে শুরু। তার মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ঢল। হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া আর মেদিনীপুর — এই চারটি জেলায় গ্রামে গ্রামে অনেক স্কুল স্থাপন হয় আর সেইসব স্কুল দেখাশোনা করবার জন্য বিদ্যাসাগরকে ইন্সপেক্টার নিযুক্ত করা হল। এই অতিরিক্ত কাজের জন্য তাঁকে আলাদা দুশো টাকা করে মাইনে দেওয়া হতে লাগলো। কলেজের মাইনে আর এই মাইনে মিলিয়ে তাঁর তখন মাসিক রোজগারের পরিমাণ দাঁড়ালো পাঁচশো টাকায়।

বিদ্যাসাগর যেমন প্রথম শ্রেণীর বিদ্বান লোক।
তেমনি দেশ-বিদ্যাজনে — দেশ-সেবাতেও বটেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন বড়লাট। তিনি একদিন সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করতে এলেন। সরল ও অনাড়ম্বর পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে দেখে তিনি অবাক হলেন। তারপর তাঁর সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ে দু'চারটে কথা বলেই বুঝতে পারলেন যে, এই মানুষটি [redacted] শিক্ষা বিস্তারের কাজে প্রকৃতই নিজেকে উৎসর্গ করে

দিয়েছেন। সনাতনপন্থী প্রাচীন সমাজের গণ্যমান্য লোকেরাও যেন এই সব টুলো-পণ্ডিত আর টিকিতে পাক দেওয়া আনুষ্ঠানিক শাস্ত্র দেখতে লাগলেন। বিদ্যাসাগর, বাল্য বিবাহ, স্ত্রী, বিধবা সবকিছুতেই প্রথম বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ করে শুরু হয়। সবচেয়ে বড়ো কথা - শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে সরকার কোন কিছুই করতেন না। সংস্কৃতের পণ্ডিত হয়েও, রাজা রামমোহনের মতো বিদ্যাসাগরও বুঝেছিলেন যে, নতুন যুগ এসেছে, তাকেই ইংরেজীকে অবহেলা করলে চলবে না। ইংরেজী শিক্ষারও দরকার। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস-দর্শন-সাহিত্য — এসবের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ছেলেমেয়েদের এখন ইংরেজী ভালোভাবে শেখা যে খুবই দরকার - এটা তিনি মনে প্রাণে স্বীকার করতেন।

নিজে তিনি টুলো পণ্ডিত, আজীবন সংস্কৃতের চর্চা করেছেন, অথচ লোকের শিক্ষা (হিন্দু কলেজ-সহ অন্যান্য কলেজগুলির হাতে বিদ্যাসাগর ছাড়ার সময়ে প্রবেশের পথ খুলিয়ে দেন নি। তিনি একদিকে যেমন অতীতের টুলো-পণ্ডিতদের আর সেকেলের খাঁটি বজায় রেখেছেন, অন্যদিকে তেমনি টেবিল, চেয়ার ব্যবহার করেছেন, ইংরেজদের যা ভালো তা — শৃঙ্খলাপ্রিয়তা ও নিয়মানুবর্তিতা — তা অনুসরণ করেছেন। এইভাবেই তিনি সুশৃঙ্খল শাসন করেছিলেন। এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব এবং মহত্ত্ব।

[illegible]

বিদ্যাসাগরের এখন বহুত কাজ।

সংস্কৃত কলেজ, চারটি জেলার স্কুল পরিদর্শক আবার নর্মাল স্কুল খোলার কথা। এর ওপর নিজের বই লেখা আছে। একে একে যখন গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তার হতে লাগলো, নতুন নতুন স্কুল খোলা হতে লাগলো, তখন একটি নতুন সমস্যা দেখা দিলো। এসব স্কুলে পড়াবার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া [redacted] যাবে কোথায়? অমনি বিদ্যাসাগরের পরামর্শ অনুসারে স্থাপিত হলো একটি নর্মাল স্কুল। এর তত্ত্বাবধানের ভারও তাঁর ওপরেই দেওয়া হলো। এই [redacted] নর্মাল স্কুলের জন্য উপযুক্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে তাঁর বন্ধু অক্ষয়কুমার দত্তকে নিযুক্ত করেছিলেন। 'চারুপাঠ' বইয়ের লেখক এই অক্ষয়কুমার সেকালের বাংলা সাহিত্যের একজন যশস্বী লেখক ছিলেন।

ইন্সপেক্টর হিসেবে বিদ্যাসাগরকে পাল্কী চড়ে জেলায় জেলায় ঘুরে স্কুলের তদারক করতে হতো। সেইসঁঙ্গে দেশের শহরে ধনী লোকেরা তাঁর কাজে সহযোগ করতেন। গ্রামের জমিদার এই সুযোগে স্কুল হলে কিছু কিছু দানও করতে থাকেন। কোথাও স্কুল খোলা হবে শুনলেই তিনি সেখানে ছুটে যেতেন, নিজে দাঁড়িয়ে সব ব্যবস্থা করে দিতেন। এ ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের যেন অন্ত ছিল না। এইভাবে জেলায় জেলায় ঘুরে তিনি অনেক স্কুল খুলে দিয়েছিলেন। এর ফলে ছেলেদের লেখাপড়ার যে কত সুবিধা হলো তা বলে শেষ করা যায়না। সেদিন এমন বিদ্যাসাগর বাংলা দেশে জ্ঞান-দীপের কাজ করেছিলেন। গ্রামের জমিদারদের বলতেন, একটা পুকুর কাটিয়ে বা একটা অতিথিশালা তৈরি করিয়ে আপনারা যে পুণ্য লাভ করে

তার অনেক বেশী উন্নতি লাভ হবে যদি একটা করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

শুধু যে ছেলেদের শিক্ষার কথাই তিনি ভাবলেন তা নয়, মেয়েদের শিক্ষার কথাও চিন্তা করলেন। বললেন, ছেলেদের যেমন, মেয়েদেরও তেমনি লেখাপড়া শেখা দরকার, নইলে জাতির উন্নতি হবে কি করে? আগে যে বেথুন সাহেবের নাম করেছি, সেই মহাপ্রাণ ইংরেজ এদেশে মেয়েদের শিক্ষার জন্য তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন। তিনি এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের খুব সাহায্য পেয়েছিলেন। একদিন তাঁরা দুজনে আলোচনা করে ঠিক করলেন যে, মেয়েদের জন্য স্কুল খোলা হবে। প্রথমে বেথুন সাহেব নিজের টাকা দিয়ে কলকাতায় হিন্দু মেয়েদের পড়বার জন্য একটা স্কুল করে দিলেন। তাঁর এই কাজে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর। এদেশে স্ত্রীশিক্ষার সেই সূচনা। সেই যে এই ক্ষেত্রে বেথুন ও বিদ্যাসাগরের নাম একসঙ্গে জড়িত হয়ে রইল। স্কুল প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই বেথুন সাহেব মারা গেলেন। বিদ্যাসাগর খুব শোক পেলেন ও স্কুলটির সমস্ত দায়িত্ব নিজে নিলেন।

এতসব করেও বীরসিংহের কথা কিন্তু বিদ্যাসাগর ভোলেন নি। একবার দেশে এসে বাবাকে বললেন, টোল করে আর দরকার নেই, বাবা। এখন ইংরেজী শিক্ষার যুগ। একটা ইংরেজী স্কুল খুলি এখানে। ঠাকুরদাস রাজী হলেন। স্কুলের জন্য জমি দেওয়া হলো। সেই জমির ওপর পাকা বাড়ী উঠলো। বিদ্যাসাগর নিজের হাতে এই স্কুলবাড়ির জন্য ইঁট গেঁথেছিলেন। এইভাবে মায়ের নামেও তিনি মেয়েদের জন্যেও এখানে একটা স্কুল নিজের খরচে করে দিয়েছিলেন।

শুধু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি বিদ্যাসাগর। তখন যেমন স্কুল ছিল না, তেমনি ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য পাঠ্য পুস্তকেরও অভাব ছিল খুব বেশি। বিদ্যাসাগরকে সেদিকেও মন দিতে হলো। স্কুল-পাঠ্য বই লেখা শুরু করতে হলো। ছোটদের এ অভাব দূর করার জন্য বাংলা ভাষায় তিনি অনেকগুলো ভালো ভালো বই লিখেছিলেন। তিনি সবচেয়ে দরকারী যে বই দুটি লিখেছিলেন, সে হলো 'বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ', 'বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ'। সাক্ষর-প্রাথমিকের জন্য আজকাল যেমন এই বর্ণপরিচয়। তখন এ রকমের কোনো ভালো বই ছিল না। প্রথম যা ছিল তার নাম 'শিশুবোধ'। বইটি তেমন ভালো না। বর্ণপরিচয় ছাড়া তিনি ছেলেমেয়েদের সহজ প্রথম পাঠের বইও রচনা করেন।

তবে বিদ্যাসাগরের আগে নয়। শুধু সেই সময়ের মধ্যেই প্রতিদিন স্কুল পরিদর্শন করতে বেরিয়ে পথে পালকিতে বসেই তিনি বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ লিখে ফেলেছিলেন। অবশ্য তার আগে শিশুপাঠ্য বই একটি তিনি রচনা করেছিলেন, তবু এই বর্ণপরিচয় তাঁর শ্রেষ্ঠ শিশুপাঠ্য বই। বিদ্যাসাগর যেমন বাংলায় বর্ণপরিচয় লেখেন, তেমনি তাঁর বন্ধু প্যারীচরণ সরকার ঠিক ঐ বইয়ের ইংরেজী বই লিখেছিলেন। তাঁর লেখা 'ফার্স্ট বুক অব রীডিং' আজও প্রচলিত উল্লেখযোগ্য শিশুপাঠ্য বই হয়ে আছে। বর্ণপরিচয় ছাড়া বিদ্যাসাগর বড়দের পড়ার জন্য সুন্দর ও সহজ বাংলা গদ্যে লিখেছিলেন 'সীতার বনবাস' ও 'শকুন্তলা' নামে দুটি বই। যে বাংলা গদ্য এখন আমরা পড়ি বা লিখি বিদ্যাসাগরই তার গোড়াপত্তন করে দিয়ে যান। এই জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বলেছেন।

॥ আট ॥

শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগরের কথা বললাম।

এইবার সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগরের কথা বলব।

তখন গরমের ছুটি। কলেজ বন্ধ। ছুটি হলেই বিদ্যাসাগর গ্রামে চলে আসতেন। এবারও তেমনি মায়ের কাছে এসেছেন। একদিন ভগবতী দেবী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে ঈশ্বর, তুই তো অনেক শাস্ত্র পড়ে মস্ত বড় একজন পণ্ডিত হয়েছিস।

বিদ্যাসাগর হেসে বললেন, লোকে বলে। পণ্ডিত হয়েছি কিনা তা জানিনা, মা। তবে শাস্ত্র কিছু কিছু পড়েছি।

— একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করবো ভাবছি।

— কি কথা, মা।

— দেশের শাস্ত্রে কি বিধান নেই, যারা খুব ছোটবেলায় বিধবা হয়, তাদের বিয়ে দেবার কোন বিধান নেই?

— হঠাৎ আজ একথা জিজ্ঞাসা করছো?

ভগবতী দেবীর পাশেই তখন দাঁড়িয়ে ছিল একটি ছোট্ট মেয়ে। বয়স তার তেরো-চোদ্দ বছর হবে। পরনে থান কাপড়। বিধবার একটি নীরব ম্লান মূর্তি। সেই মেয়েটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ভগবতী দেবী বললেন, ঐ ছোট মেয়েটিকে মাসে দুবার উপোস করতে দেখি। বড় অভাগিনী। একাদশীতে ওর ছাতি ফেটে গেলেও এক ফোঁটা জল পর্যন্ত মুখে দিতে পারবে না।

বলতে বলতে তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে উঠলো। বিদ্যাসাগরের চোখেও জল

গেল। তারপর সমাজের সম্মানে কাছে বললেন, ফিরে গিয়ে দেখব, শাস্ত্রে কোথাও বিধান আছে কিনা। কিন্তু নিরম্বু একাদশী পালন নাই বা করল।

— মেয়েটাকে দুবেলা জল-মিষ্টি খাওয়াতে দেব? দোষ হবে না তো?

— কিছু দোষ হবে না, মা। আমি বলছি।

দুটি চুটিয়ে [illegible] ফিরলেন বিদ্যাসাগর। আবার সময় [illegible] বলে দিলেন, ভুলিস নি, ঈশ্বর। শাস্ত্রে বিধবাদের বিয়ের কোথাও বিধান আছে কিনা দেখিস। [illegible] ভোলেন নি তিনি। সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিতে শাস্ত্রের যত পুঁথি ছিল — অনুসন্ধান, পরাশর সংহিতা প্রভৃতি — সব খুব মন দিয়ে পড়তে লাগলেন। চোখের সামনে ভেসে ওঠে [illegible] সেই কালিমা বিধবার [illegible] আর তাঁর সঙ্গে [illegible] মায়ের সেই কথা — শাস্ত্রে কি বিধবা বিয়ের বিধান নেই?

রাত দুটো বেজে গিয়েছে। বিদ্যাসাগর তন্ময় হয়ে পড়ে চলেছেন পাতার পর পাতা — পুঁথির পর পুঁথি। শ্লোকের পর শ্লোকের ওপর দিয়ে চলে চলেছে তাঁর দৃষ্টি। মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন, বিচার করছেন। সেই সঙ্গে আবার বিধবা সমস্যার দিক থেকেও বিষয়টি ভেবে বিবেচনা করছেন। হঠাৎ এই সময় তাঁর মনে পড়ল রামমোহনের কথা। সহমরণের শ্রেষ্ঠ যুক্তি যারা দেখাতো [illegible]। মনে পড়ল তাঁর সেই সমস্ত হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সতীদাহ নিবারণের ঐতিহাসিক কাজের কথা। শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়ে তিনি সেদিন যা চালু করতে পারেননি। আইনের সাহায্যে তিনি সেই অমানবিক প্রথার

করেছিলেন — সেই নিষ্ঠুর কথা তোর থেকে উঠিয়ে দিয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণের সেই দুঃখভরা কথা শুনে বসে, তখন বিদ্যাসাগর ভাবলেন তাদের মর্যাদার হাত ছাড়িয়ে নাও। নামলেন তিনি একা। পরক্ষণে মেয়েদের অনেক বিচিত্র বিষয়ের মাধ্যমে কাটে প্রশংসা কেউ বোঝেন তিনি। এই যে এখনো প্রচলিত রয়েছে, তা উঠেছে তিনি। ঠিক সেই সময় তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছেন তাঁর কাছে। — কিসের অবস্থা প্রচলিত? জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। — বিধবা বিবাহের। উত্তর দিলেন বিদ্যাসাগর।

— শোনো রাজকৃষ্ণ, আমি বিধবার বিয়ে দেব।

— বিধবার বিয়ে দেবে!

— হ্যাঁ, আমি বিধবার বিয়ে দেব। শাস্ত্রে তার সমর্থন আছে।

সমস্ত দেশ এতে হয়তো ক্ষুব্ধ হবে। অনেকে হবেন তাঁর বিরোধীদের দল। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সংগঠিত হয় তাঁর বিরুদ্ধে দল। তাঁদের তীব্র বিদ্রূপ বাণের সম্মুখীন হন। বিধবার বিয়ে! এ কেমন কথা! তাঁকে হত্যার চক্রান্ত ষড়যন্ত্র — মানুষের অপমান অত্যাচার চলেছে। তিনি সকলের-মধ্যে সেই সিংহ গর্জন — 'আমি বিধবার বিয়ে দেব' · প্রথমে যেন সবাই হতো চকিত স্তব্ধ। [redacted] তাঁর মানবপ্রেমী শান্তি তাঁর [redacted] এক নতুন চেহারা দেখলো — দেখলো সম্পূর্ণ অভেদ, স্বাধীন একক একজন মানুষ। যার কোটি বাঙালীর অন্তরে অপ্রতিরোধ্য পর্বতের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন তাদের সামনে।

বিদ্যাসাগরের যে কথা সেই কাজ। শাস্ত্র থেকে যুক্তি বের করে দিয়ে বললেন, অল্প বয়সে যেসব মেয়ে বিধবা হয়, তাদের আবার বিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এতে কিছু নষ্ট হয়ে যাবে না, বরং লোকেরই ভাল। পণ্ডিত সমাজে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল। — কোথায় পেলে শাস্ত্রের যুক্তি, দেখাও, বললেন তাঁরা সবাই। — এই তো পরাশর সংহিতায় প্রমাণ রয়েছে। শ্লোক তুলে ধরে তার ব্যাখ্যা করে দেখালেন বিদ্যাসাগর। — বিদ্যাসাগরের ব্যাখ্যা ভুল, পণ্ডিতের দল হেসে চেঁচিয়ে উঠলেন। — ভুল বললেই তো হবে না। দেখিয়ে দিতে হবে কোথায় ভুল। প্রমাণ করতে হবে। বললেন বিদ্যাসাগর।

শেষে ঠিক হল। শোভাবাজার রাজবাড়িতে বসবে সেই বিচার-সভা। সারা বাংলার পণ্ডিতেরা হাজির হয়েছিলেন সেই সভায়। এমন বিচার-সভা এর আগে অনেককাল কেউ দেখেনি। [illegible] সেই সভায় বিদ্যাসাগর আবার সেই শ্লোকটি তুলে, শাস্ত্রের বিধান বুঝিয়ে বললেন, এই দেখুন, বিধবার বিয়ে শাস্ত্রসম্মত।

— ঠিক কথা। কিন্তু এ বিয়ে দেশাচারের বিরুদ্ধে।

— তাতে কী? দেশাচার বড় কথা নয়। শাস্ত্রই আমাদের কাছে বড়।

পণ্ডিতেরা তখন আর কোনো যুক্তি না পেয়ে অপমান করতে চাইলেন, অপমান করলেন।

বীরসিংহের সিংহ বালক একটুকু টললেন না। শেষ পর্যন্ত বিচারসভায় তাঁরই জয় হলো। জয় হলো বটে, কিন্তু তাতে খুব বেশি কাজ হলো না। তারপর বিদ্যাসাগর এই বিষয়টি নিয়ে দুখানা বই লিখলেন। ছড়িয়ে দিলেন দেশময় সেই বই। তাঁর আশা ছিল, এই বই পাঠ করে বিধবা বিয়ের অনুকূলে মত তৈরি হবেই। বই দুটির ইংরেজী অনুবাদও করলেন তিনি। পাঠিয়ে দিলেন সেই অনুবাদ লাট-সাহেবের কাছে। শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে যখন কিছু করা গেল না, তখন তিনি আইনের সাহায্য নিতে চেষ্টা করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে পঁচিশ হাজার লোকের সই-করা একখানা দরখাস্ত বড়লাটের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেই দরখাস্তে বলা হলো, বিধবা বিয়ের জন্য যেন অবিলম্বে একটি আইন পাশ করা হয়। দেশের ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই বিদ্যাসাগরের এই কাজটি সমর্থন করলেন। অন্য দিকে যাঁরা রক্ষণশীল ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকেও একখানা পাল্টা দরখাস্ত গেল লাট সাহেবের কাছে।

গোটা বাংলাদেশের হাটে মাঠে ঘাটে সকলের কেবল দুটি কথা শোনা যেত — বিদ্যাসাগর আর বিধবা বিয়ে। এই নিয়ে কত পাঁচালী তৈরি হলো, ছড়া লেখা হলো, নাটক পর্যন্ত লেখা হলো। এ প্রসঙ্গে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হলো দেশময়। ছড়া ও গানে ছেয়ে গেল বাংলার পল্লীর পথঘাট, মাঠ। তাঁতী তাঁত বোনে, চাষী লাঙল চালায়, গাড়োয়ান গরুর গাড়ি হাঁকায় মুখে ছড়া গেয়ে গেয়ে। শান্তিপুরের শাড়ির পাড়ে সেই ছড়া :

সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবার হবে বিয়ে॥

কবি ঈশ্বরগুপ্ত লিখলেন:

বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল॥

দাশুরায় সুর বাঁধলেন:

বিধবার বিবাহ হবে কলির প্রথমভাগ কলিকাতায়,
নগরে উঠেছে ধ্বনি রব।

এইভাবে তুমুল আলোড়ন জেগেছিল সেদিন। দরখাস্ত নিষ্ফল হলো না। বিদ্যাসাগরের জোরই শেষ পর্যন্ত বজায় রইল। সরকার [redacted] যথাসময়ে আইন পাশ করলেন। লর্ড ক্যানিং তখন বড়লাট। তাঁরই আমলে সমাজ-সংস্কারের এই বিপ্লবী আইন—বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন—পাশ হয়েছিল এবং এর ফলেই হিন্দু সমাজে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। সকলে ও সবার (মেয়ে/মুখে-ই) ধন্য ধন্য শুরু করলো। বাংলার বিধবাদের এক [illegible] চোখের জল, যা এতো এতকাল কেউ দেখেনি, বিদ্যাসাগর যেন নিজের হাতে মুছিয়ে দিলেন। বীরসিংহ গ্রামে বসে অল্পকালের সব খবর শুনে ভগবতী দেবী তাঁর ছেলেকে প্রাণখুলে আশীর্বাদ জানিয়ে একটি চিঠি দিলেন। সেইসঙ্গে ঠাকুরদাসও একটি চিঠিতে লিখলেন: 'ঈশ্বর, তুমি চিরজীবী হও।'

আইন পাশ হলো। বিদ্যাসাগর কিন্তু এইখানেই থামলেন না।

এইবার তিনি উদ্যোগী হয়ে আর বিধবাদের বিয়ে দিতে লাগলেন। অনেকে এই ব্যাপারে তাঁকে টাকা দিয়ে সাহায্য করলেন, আবার অনেকে করলেন প্রবল বিরোধিতা। ব্রাহ্মণ তাতেও দমলেন না। নিজের টাকা দিয়েই তো তিনি বিধবাদের আন্দোলনটা চালিয়েছিলেন তখন। এর আগে করেছিলেন রামমোহন সতীদাহ নিবারণী আন্দোলনের সময়। নিজের সর্বস্ব পণ করেই বিদ্যাসাগর এই সমাজ-কল্যাণের কাজে নেমেছিলেন। তাছাড়া তাঁর আশীর্বাদ মায়ের। ছিল তাঁর সহায়, প্রেরণা। দেখতে দেখতে এক এক করে অনেকগুলি বিধবা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। প্রত্যেক বিয়েতেই বিদ্যাসাগর নিজে উপস্থিত থাকতেন. আর নিজে প্রচুর খরচ করতেন ঠিক কুমারীদের মেয়ের বিয়ের মতো।

বাংলার অন্ধকার সমাজের বুকে জ্বলে উঠল নতুন চেতনা।

সেই চেতনার আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠে নবজাগরণের কালচিত্র।

বিধবার বিয়ে দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের হলো সে কি অবস্থা। তাঁর সংসার অচল হলো। এই ব্যাপারে জলের মতো তাঁর টাকা খরচ হতে লাগল, সেদিকে কিন্তু তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। অর্থলোভে তিনি অটল, প্রতিজ্ঞায় তিনি দৃঢ়। তবুও সেসময় সেদিন তাঁর শত্রু কম হয়নি। এমন কি বীরসিংহে তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছিল নানাভাবে। তাঁর দেশের বাড়ি-ঘর পর্যন্ত পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কলকাতায় বসে বিদ্যাসাগর এই দুঃসংবাদের খবর পেলেন। তখন তিনি মাকে এক চিঠিতে লিখলেন, 'বাড়ির জন্য দুঃখ পাইবেন না। আপনাদের জন্য আমি আবার একটি নূতন বাড়ি তৈয়ার করিয়া দিব।'

কলকাতায় তাঁর কাজের পথে অত্যাচারের শেষ হয়নি সেদিন। তবে তাঁর

পথে পথে চলাই দায় হয়ে উঠেছিল। রাস্তায় বেরুলেই চারদিক থেকে লোকজন তাঁকে ঘিরে ফেলতো — কেউ করতো নিন্দা, কেউ বা দিত অশ্রাব্য গালাগালি। এমনকি অনেকে কেউ কেউ আড়ালে এই বলে, বাবুমশাইকে একদিন [illegible] মেরেই ফেলবো।

সকলেই বিদ্যাসাগরকে মারবার জন্য নানা ফন্দী এঁটেছিল সেদিন। তাই সে দিনে যে সমাজের বুকে বিপ্লব এসেছিল। কলকাতার [illegible] নামকরা [illegible] তাঁর [illegible] [illegible]। কিন্তু নির্ভীক ঈশ্বরচন্দ্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। একদিন [illegible] বাড়ি ফিরছেন। তখন [illegible] [illegible] সঙ্গে [illegible] দল তাঁকে মারবার জন্য তৈরি হয়ে রইল। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ছিল তাঁর দেশের [illegible] শ্রীমন্ত। [illegible] [illegible]। বাড়ি [illegible] পর থেকে [illegible] [illegible] এই শ্রীমন্তকে দেশ থেকে [illegible] ছিলেন। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] সঙ্গে [illegible] [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] বিদ্যাসাগর [illegible] [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] লাগিয়েছিল।

পরের দিন সকালে বেলায় বিদ্যাসাগর [illegible] সেই [illegible] বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। [illegible] দল তাঁকে [illegible] ঘিরে বসে আছে আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে — এবার আর বিদ্যাসাগরের রক্ষা নেই। এই নিয়ে খুব হাসাহাসি চলছিল। ঠিক সেই সময় তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন ধুতি-চাদর-পরা, পায়ে চটি [illegible] বিদ্যাসাগর। সবাই [illegible] উঠে। [illegible] বিদ্যাসাগর [illegible] সম্মুখে! — আমাকে মারবার [illegible] [illegible] [illegible] লাগিয়েছেন? [illegible], এই

...য়ে নিতে এসেছি। ইচ্ছা করলে এখন আমাকে মেরে ফেলতে পারেন। আমি তৈরী হয়েই এসেছি।" — বললেন ধীর গম্ভীর স্বরে বিদ্যাসাগর।

হতভম্ব লোকটা আর টুঁ শব্দ করে বসে রইলো।

যে আন্দোলনের তিনি নেতা ছিলেন, যাকে সফল করতে তিনি হয়েছিলেন সর্বস্বান্ত, সেই বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে সফল করবার জন্য নিজের একমাত্র ছেলে নারায়ণচন্দ্রের বিয়ে দিয়েছিলেন একটি বিধবা মেয়ের সঙ্গে। সকল সংসারের হিসাব করতে হয় আর তিনি একেবারেই দেখিয়া গেছেন। সমাজসংস্কারকের মধ্যে বিদ্যাসাগরই এদেশের শ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারক। প্রায় একশোটি বিধবা মেয়ের তিনি বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এতে তাঁর অনেক টাকা দেনা হয়ে যায়। যারা প্রথমে অনেকে যাঁরা এই আন্দোলনে টাকা দিয়ে তাঁকে সাহায্য করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, তারা অনেকেই শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সমাজের গোঁড়া পণ্ডিতদের বিদ্রূপ, বা বিরোধিতা, এমন কি প্রাণের ভয় পর্যন্ত — কোনো কিছুই বিদ্যাসাগরকে তাঁর এই ব্রত থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তাইতো তিনি বলতেন, 'এই কাজই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ।'

এই শ্রেষ্ঠ কাজ সম্পন্ন করেই বিদ্যাসাগর পুণ্যশ্লোক হয়েছেন।

—